পূজার মালা।

মূল্য বার আনা।

গল্প।

সুরেশ্বরী দেবী প্রণীত।

Printed by :—
S. C. Chakrabarti, at the
Kalika Press.
17, Nunda Coomar Chowdhury's 2nd Lane,
CALCUTTA.

Published by;—
SACHIS CHUNDRA CHATTERJI,
18. Nabin Sarkar Lane, Calcutta.

প্রকাশকের নিবেদন।

আমি প্রকাশক মাত্র ; যিনি লেখিকা, তিনি ইহধামে নাই।

তিনি ফুল চয়ন করিয়াছিলেন—মালা গাঁথিবার জন্য ; কিন্তু সময় পাইলেন না—অকালে অপহৃত হইলেন।

আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুষ্পনিচয় সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিলাম।

গাঁথিলাম বটে, কিন্তু হস্ত রুধিরাক্ত হইল—ফুলেও দাগ লাগিল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মালা ছোট করিলাম, বড় হইলে ধূলায় লুটায়।

কয়েকটি গল্প ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোনটা লেখিকার স্বীয় নামে, কোনটা বা তাঁহার বালক পুত্রের নামে। সে পুত্র বা লেখিকা কেহই এক্ষণে নাই ;—কয়েক মাস পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন।

তা'র পর প্রবন্ধের কথা। প্রবন্ধগুলি আমার রচিত। কিন্তু সকল অংশ নয়। আমি কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে লেখিকা আমার স্থানে বসিয়া, খাতা খুলিয়া কিছু না কিছু লিখিয়া রাখিতেন। আমার রচনার সঙ্গে তাঁহার রচনা মিশিয়া গিয়াছে; এক্ষণে বলা সুকঠিন কোন্ অংশ তাঁহার, কোন্ অংশ আমার রচিত। সুতরাং সকল অংশই প্রকাশ করিলাম। ইতি—

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১৩১৮ } শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অর্পণ।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যাভূষণ—

ভাই নারায়ণ বাবু!

তুমি বিনে এ মালা কা'র কাছে গচ্ছিত রাখিব? কা'র কাছে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব? সংসারময় নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তোমার মত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র অল্পই দেখিলাম; তাই, তুমি যাহাদের আহৃত লতাটি পাতাটি পর্য্যন্ত স্নেহ চক্ষে দেখিয়া থাক, তাহাদের রচিত ফুলের মালা তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

কিন্তু ভাই, গচ্ছিত রাখিলাম মাত্র। দুই দিন বাদে যখন এ পৃথিবী ছাড়িয়া গৃহে ফিরিব, তখন তোমার নিকট হইতে মালা ফিরাইয়া লইব। যাঁহার পূজার্থে এ মালা গ্রথিত, তাঁহার গলায় সাক্ষাৎকারে পরাইয়া দিব।

ভাই, মালা গ্রহণ কর; কিন্তু দেখিও, হাতে যেন দাগ লাগে না,—আমার এ মালা রুধির-রঞ্জিত। ইতি—

শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পূজার মালা।

একবার দেখা।

(১)

শিবপূজা সাঙ্গ করিয়া অলকাসুন্দরী একটী ছোট বাটীতে একটু জল লইয়া শাশুড়ী দেবীর পদপ্রান্তে বসিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন,—

"আ অভাগী, কতই পূজা করছিস—কতই পাদোদক খাচ্ছিস্, কই তোর কপাল ত ফিরে না?"

নতবদনা অলকার চক্ষু বহিয়া জল গড়াইল। শ্বাশুড়ী, বউয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এবার তোমায় লইয়া সেই হতভাগা ছেলের কাছে যাব—দেখিব, তোমার কপাল ফিরে কিনা।"

শ্বাশুড়ীর পদতল সযতনে ধৌত করিয়া অলকা ভক্তি সহকারে জলটুকু খাইল; এবং মাথায় বুকে একটু দিল। তারপর উদ্দেশে স্বামীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল, "কোথায় আমার দেবতা! কোথায় আমার সর্ব্বস্ব ধন! জীবন থাকিতে দাসী কি তোমার দেখা পাবে না! জীবনও ত আর বেশী দিন থাকে না!"

---

(২)

অনিলকুমারের অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে দশমবর্ষীয়া অলকার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর যখন বরকনে বাড়ী আসিয়া নামিল, তখন "বউ কালো—ছেলের যোগ্য নয়" ইত্যাদি নানারকমের কথা মেয়ে-মহলে প্রচারিত হইল। কথাটা অনিলের কাণেও গেল। বিস্তৃত উঠানের মধ্যস্থলে দুধে আল্‌তায় পা দিয়া কনে

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে বর নিম্নদৃষ্টে ধানের কাঠা ধরিয়া দণ্ডায়মান। ভগবতী দেবী আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া ছেলে-বউ বরণে ব্যাপৃতা। অনিলকুমার দেখিলেন, বউয়ের পা কালো। ছি, কালো পা কি দুধে আলতায় মানায়! অনিলকুমার সে কালো মুখ পানে আর চাহিয়া দেখিলেন না।

তা'রপর সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অনিলকুমার সে কালো মুখপানে আর ফিরিয়া দেখিলেন না। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন—কলিকাতা হইতে আর গৃহে ফিরিলেন না। অভাগিনী অলকা কত কাঁদে—মা কত কাঁদিয়া চিঠি লিখেন; কিন্তু অনিলকুমার কিছুতেই আর বাড়ী আসিলেন না। স্বামি-পরিত্যক্তা অলকা আর কি করিবে? সে শুধু কান্না সম্বল করিয়া, শিবপূজা করিয়া, ভগবতীর পাদোদক পান করিয়া দিন কাটায়। কিন্তু দিন যে আর কাটে না!

---

(৩)

ভগবতী, বউকে লইয়া কলিকাতায় অনিলকুমারের বাসায় আসিয়াছেন।

একদা সন্ধ্যার পর ভগবতী পুত্রকে কহিলেন, "ছি বাবা, আজ রাতে আর বাহিরে যাইও না। বউ যে আমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। এমন লক্ষ্মীমন্ত বউয়ের পানে তুমিত একটীবার চাহিয়া দেখিলে না— একবার দেখ—বাবা, একবার চেয়ে দেখ।"

অনিল। ওই কথাটী আমায় বলিও না, মা। তুমি আর যাহা বলিবে সব পারিব, কিন্তু তার মুখ দেখিতে পারিব না।

ভগবতী। কোন্ অপরাধে তুমি ঘরের লক্ষ্মী, বৌয়ের মুখ দেখিবে না?

অনিল। অপরাধ কি তাহা আমি জানি না। কিন্তু যার মুখ দেখিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, তা'র মুখ আমি দেখিতে পারিব না।

অনিল চলিয়া গেল। কপাটের পাশ হইতে একখানি অশ্রুসিক্ত ছোট মুখ ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তারপর নিস্তব্ধ নিশীথে নির্জ্জন গৃহে ভূশয্যায় পড়িয়া অলকা

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "মা আমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন; কিন্তু আমি কেমন করিয়া এ স্থান ছাড়িয়া যাইব? এ যে আমার স্বর্গ। এখানে থাকিয়া তাঁহাকে দিনান্তে একটীবারও লুকাইয়া দেখিতে পাই—একটীবারও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। হায়, আমার সে সুখ বুঝি ঘুচিয়া যায়। আমি যে লজ্জায় মাকে কিছু বলিতে পারি না। ওগো, তোমরা কেহ বলিয়া কহিয়া আমাকে এ তীর্থে রাখাইয়া দেও না গা!"

কিন্তু কেহ রাখাইয়া দিল না;—শাশুড়ীর সহিত অলকাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইল।

তারপর কয়েকমাস কাটিয়া গেল।

---

(৪)

শয্যাশায়িতা অলকা ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "মা কই?"

"এই যে মা, আমি তোমারই কাছে আছি।"

অলকা। মা, আর আমি বাঁচিব না।

ভগবতী। ছি, অমন কথা বলিতে নাই।

অলকা। মা, আমার মরিবার সময় তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দিও। আর—আর—

ভগবতী। আর কি মা?

কিন্তু অলকার আর কথা সরিল না; ক্ষীণ শুষ্ক গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে আঁখিজল গড়াইতে লাগিল। অলকা ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি মরিয়া গেলেও তিনি কি বাড়ীতে আসিবেন না?"

ভগবতী বস্ত্রাঞ্চল চো'খে দিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। অলকা বলিল, "যদি আসেন তাহা হইলে যেখানে আমাকে দাহ করা হইবে, সেই স্থানে তাঁহাকে একবার যাইতে বলিও।"

কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবতী বলিলেন, "কেন মা, অমন কথা বলিতেছ?"

সে কথা কাণে না তুলিয়া অলকা বলিল, "যদি সেই শ্মশানক্ষেত্রে আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখের জল এক ফোঁটাও পড়ে, তাহা হইলে——।"

"ছি, আবার ওই কথা বলিতেছ!"

অলকা বলিতে লাগিল,—"তাহা হইলে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে—আমার রমণী-জনমের সকল সাধ মিটিবে।"

---

(৫)

কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর অলকার পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল। ক্রমে চলিবার শক্তিও গেল; অবশেষে অলকা শয্যাগত হইল। ভগবতী মহা চিন্তিতা হইয়া ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার বাবু পরীক্ষান্তে বলিলেন, রোগ কঠিন—জীবন সংশয়। জেলা হইতে বিচক্ষণ চিকিৎসক আসিলেন; তিনি দেখিয়া বলিলেন, কাসরোগ (থাইসিস্) জন্মিয়াছে। ভগবতী তখন ভীত হইয়া কন্যা ও জামাতাকে আনিলেন।

কন্যা কুলদা আসিয়া দাদার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি আসিলেন না। চিঠির উপর চিঠি, লোকের উপর লোক গিয়াছে, তবু তাঁহার দেখা নাই। অলকা হতাশ হইয়া কুলদাকে বলিল, "ঠাকুর ঝি, আমার শেষ দিনেও কি তিনি একবার দেখা দিবেন না?"

কুলদা উত্তর করিল, "তুমি নিশ্চয় জেনো বউ, দাদা আসিবেন। দাদাকে না দেখিয়া তোমার মরা হ'বে না।"

অলকা। বুঝি জীবন থাকিতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। জীবন যে শেষ হয়ে এল, দিদি।

কুলদা। তোমার মত সতী সাবিত্রীর কামনা বিফল হয় না। তুমি নিশ্চয় জেনো, দাদাকে না দেখিয়া তুমি মরিবে না।

---

(৬)

কলিকাতাস্থ একতম অট্টালিকা মধ্যে কোন সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া সুরাপানোন্মত্ত বন্ধুবান্ধব-পরিবেষ্টিত অনিল-কুমার আনন্দ উপভোগে (!) নিবিষ্টচিত্ত। তিনি এক্ষণে কালো ছাড়িয়া জনৈক দুগ্ধালক্তকনিন্দিবরণা যুবতী পাইয়াছেন। যুবতী গাহিতে জানে, নাচিতে জানে, তার উপর আবার রূপ।

ভোরপুর মজলিস।—পাখোয়াজের বোল—তবলার চাটি—নূপুরের ধ্বনি—সঙ্গীতের ঝঙ্কার কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। অনিলকুমার পূর্ণসুখে উন্মত্ত! এই পূর্ণসুখে বাধা দিয়া তাঁহার ভগিনীপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সজলনয়নে কহিলেন, "একবার চল অনিল,—একবার চল;—তোমার সেই মৃতকল্প স্ত্রীকে একবার দেখিবে চল।"

গীতবাদ্য থামিয়া গেল। অনিলকুমার উত্তর করিলেন, "আমি যাব না—সে কালো স্ত্রীর মুখও দেখ্‌ব না।"

জনৈক বন্ধু বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাহবা! বাহবা! একেই ত বলি পুরুষ বাচ্ছা।"

ভগিনীপতি বলিলেন, "একবার দেখ্‌বে না?"

অনিল। না, দেখ্‌ব না।

ভ প। আচ্ছা, আজ আমি রহিলাম—কাল্ তোমায় নিয়ে যাব।

---

(৭)

আজ বড় ভয়ানক দিন। ডাক্তার বলিয়াছে, আজ রোগিণীর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।

তাপদগ্ধা নীলবরণা অপরাজিতার ন্যায় অলকা শয্যোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে, কুলদা বারিভারাকুল নয়নে উপবিষ্টা। মাথার শিয়রে, বধূবৎসলা ভগবতী দেবী, বধূ-মুখ পানে চাহিয়া নীরবে অজস্রধারায় আঁখিজল ফেলিতেছেন। বারান্দায় ডাক্তার ও প্রতিবেশীরা উদ্বিগ্ন-চিত্তে দণ্ডায়মান।

"কই মা—আমার দেবতা কই? একবার দেখা, মা।"

শ্বাশুড়ী কি উত্তর দিবেন? তিনি নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অলকা একবার ঘাড় ঘুরাইয়া চারিদিক্ দেখিল। চক্ষু যেন কি খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া নয়ন আবার মুদ্রিত হইল।

এমন সময় সেই ঘরে ধীরে ধীরে গম্ভীর জলদখণ্ডের ন্যায় অনিলকুমার আসিয়া মুমূর্ষু পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। অনিল স্থিরদৃষ্টিতে পত্নীর কালো মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখ দেখি, অনিল, একবার দেখ, এই কালো মুখ কত সুন্দর! এমনটা আর কোথাও দেখিয়াছ কি? তোমার সেই প্রেতপুরে—তোমার কল্পনার নন্দনে এমন সুন্দর, এমন পবিত্র কিছু দেখিয়াছ কি?

মুদ্রিতনয়না অলকা বলিল, "একবার দেখা।"

"চেয়ে দেখ না, মা।"

অলকা নয়ন উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, এই আট বৎসর ধরিয়া নিয়ত যাঁহার ধ্যান করিয়া আসিয়াছে—দেবতা-জ্ঞানে যাঁহাকে পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই দেবতা সম্মুখে। ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে অলকা বলিল, "এসেছ, প্রভু! এতদিনে দয়া হ'ল? তবে তোমার পদধূলি আমার মাথায় দেও। আশীর্ব্বাদ

কর, যেন জন্মান্তরে এমনি শ্বাশুড়ী, এমনি স্বামী পাই।"

আর কথা সরিল না। অনিলের চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিয়া অলকা অনন্তধামে চলিয়া গেল।

---

(৮)

ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল,—ধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইল। আজন্ম স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা পতিব্রতার দেহ, অগ্নির তেজে পুড়িয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিল।

এমন সময় "একবার দেখা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অনিলকুমার উন্মত্ত ভাবে শ্মশানে ছুটিয়া আসিল।

"একবার দেখা—ওগো একবার দেখা।"

অনল গর্জ্জিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখাব ?"

"আমার সেই কালো মুখ।"

বলিতে বলিতে অনিলকুমার আছাড় খাইয়া সেই প্রজ্বলিত চিতার উপর পড়িল,—কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিল না। তখন লোকে শুনিল, স্থলজল-ব্যোম চমকিত করিয়া চিতার মধ্য হইতে কাতরকণ্ঠে চীৎকার উঠিল, "একবার দেখা—ওগো, একবার দেখা।" কণ্ঠ

ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। যতক্ষণ না চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, ততক্ষণ লোকে শুনিয়াছিল, অনল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—"একবার দেখা—ওগো, একবার দেখা।"

চিতা নিবিয়া গেল। দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। ক্রমে অলকার স্মৃতিও সকলের হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু আজও লোকে শুনিতে পায়, গভীর নিশীথে শ্মশান হইতে চীৎকার উঠিতেছে, "একবার দেখা—ওগো একবার দেখা।"

দুইবন্ধু।

(১)

ইচ্ছামতী-উপকূলে বসিয়া সন্তোষকুমার প্রবাসগমনেচ্ছু বন্ধু গিরিজানাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসবে?"

গিরিজা উত্তর করিল, "তা ঠিক বলিতে পারি না।"

সন্তোষ। ঠিক না বলিতে পারিলেও একটা আন্দাজ করিয়া ত বলা যায়।

গিরিজা। আমি জীবিকা-প্রার্থী; যতদিন না জীবিকা মিলিবে ততদিন গৃহে ফিরিব না।

সন্তোষ। যতদিন না মিলে ততদিন গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কি প্রকারে?

গিরিজা। গৃহেই কি অন্ন আছে?

সন্তোষ। না থাকুক, তবু অনাহারে মরিতে হয় না।

গিরিজা। এতদিন যে মরি নাই সে তোমারই কৃপায়।

সন্তোষ। অনুগ্রহ ভগবানের, আমি আর কি করিয়াছি?

গিরিজা। তুমি যা' করেছ তা' কখন ভুলিব না,—বুঝি মায়ের পেটের ভাইও এতটা করে না।

সন্তোষ। তুমি কি আমায় কাঁদাবার মতলব করেছ? ও-সব কথা আমার ভাল লাগে না।

গিরিজা। ভাল যে লাগে না, তা' আমি জানি। যে স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, সে নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করে না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রুধিরাক্ত রবি, ইচ্ছামতী-বক্ষোপরি হেলিয়া পড়িয়াছে,—যেন রক্তরাগ ধুইবার আশায় স্নানে নামিয়াছে। তা'র রক্তরাগ-ধৌত জলে ইচ্ছামতীরও খানিকটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা, স্নানজল মাথায় ধরিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটা মূর্খ মাঝি সে পবিত্রতা, সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না,—একখানা ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া সেই সুন্দর জল মথিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। সন্তোষকুমার নৌকা পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রাখিয়া গেলে ভাল হইত!"

গিরিজা। সেখানে কা'র কাছে রাখিয়া যাইব?

সন্তোষ। কেন, তাঁর ভাইয়ের কাছে।

গিরিজা। ভাই ধনী, আমরা দরিদ্র; সেখানে পাঠাইতে প্রবৃত্তি হয় না।

সন্তোষ। এখানে নিঃসহায় রাখিয়া যাইতে প্রবৃত্তি হয়?

গিরিজা। হয়।

সন্তোষ। কেন?

গিরিজা। এখানে যে তুমি আছ।

উভয়ে নীরব—স্থির নদীপানে চাহিয়া উভয়ে নীরব। উভয়ের হৃদয় মেঘভরা—চক্ষু জলপোরা। তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। আর সে লাল জল নাই—রং উঠিয়া গিয়াছে। সম্মুখে শুধু কাল জল। গিরিজা বলিল, "ভাই, লাবণ্যকে দেখিও; লাবণ্য আমার সর্ব্বস্ব। সে আমার সর্ব্বস্ব বলিয়াই তোমার কাছ-ছাড়া আর কোথাও তাহাকে রাখিয়া যাইতে পারিলাম না।"

সন্তোষ কোন উত্তর দিতে পারিল না; তা'র গলাটা তখন রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, আঁখিতে জল উথলিয়া উঠিতেছে। উচ্ছ্বসিত মনোভাব লুকাইবার আশায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল। গিরিজাও উঠিল। তখন আকাশে

নক্ষত্র উঠিয়াছে। গিরিজা বলিল, "ভাই, প্রাণ বড় কাঁদিতেছে।"

সন্তোষ। কেন এত অধীর হচ্ছ?

গিরিজা। তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি বলে তত নয়।

সন্তোষ। তবে?

গিরিজা। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

সন্তোষ। কি দেখেছ?

গিরিজা। যেন তোমাতে আমাতে আর দেখা হবে না।

সন্তোষ স্তম্ভিত হইল। সন্তোষের বিশ্বাস, স্বপ্ন বড় একটা মিথ্যা হয় না। তবু সে গিরিজাকে সান্ত্বনা দিয়া নিজের হৃদয়কে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "স্বপ্ন কখন সত্য হয় না।"

গিরিজা। তুমি তবে কখন আমার মত স্বপ্ন দেখ নি; আমি যা' দেখি, তা' কখন মিথ্যা হয় না।

সন্তোষ। ও সব বাজে কথা রাখ; এখন ঠিক করিয়া বল দেখি, কবে ফিরিবে?

গিরিজা। তা' কেমন করিয়া বলিব? ফেরা ত আমার হাত নয়।

সন্তোষ। মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে সব করিতে পারে।

গিরিজা সহসা কোন উত্তর করিল না;—আকাশ-প্রান্তে একটা তারকাপানে চাহিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল, তা'রপর দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুন সন্তোষ, আজ শ্যামাপূজা। আগামী বৎসর এই দিনে ফিরিব স্থির করিলাম। যদি পূজার দিন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর মধ্যে তোমাতে আমাতে সাক্ষাৎ না ঘটিল, তবে জানিবে, এ জীবনে আর দেখা হইল না।"

সন্তোষ। আমি বলিতেছি, তোমাতে আমাতে আবার সাক্ষাৎ হইবে। স্বপ্নের কথা ভুলিয়া যাও—আমার কথা স্মরণ রাখ।

গিরিজা। মিথ্যা সান্ত্বনা দিতেছ, সন্তোষ কুমার! তোমাতে আমাতে এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না।

সন্তোষ। আমি বলিতেছি, আবার সাক্ষাৎ হইবে। যদি শান্তি স্বস্ত্যয়নের কোন মাহাত্ম্য থাকে—যদি পূজা-অর্চ্চনায় কোন শক্তি থাকে, তবে তোমাতে আমাতে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

গিরিজা। অসম্ভব! স্থির জানিও ভাই, নিয়তি পরিবর্ত্তিত হইবার নয়।

সন্তোষ। পুরুষকার কি নিয়তির গতিরোধ করিতে পারে না?

গিরিজা। না ;—ভগবানও পারে না।

সন্তোষ। ভাল, দেখা যাবে, নিয়তির গতিরোধ করা যায় কিনা।

গিরিজা। উত্তম।

তখন দুইজনে আপন আপন চিন্তারাশি হৃদয়ে ধরিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

---

(২)

নদীর উপরেই গ্রাম। গ্রামের নাম ইলাপুর। তথায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। গ্রামখানি বেশ বড়। একজন ধনী দুরন্ত জমীদার তথায় বাস করেন; সুতরাং গ্রামখানিকে একটি ছোট নগর বলিলেও চলে।

সন্তোষ ও গিরিজার এই গ্রামেই বাস। সন্তোষের সাংসারিক অবস্থা ভাল। মেডিকেল কলেজে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সন্তোষ এক্ষণে স্বগ্রামে ডাক্তারি করিতেছেন। গৃহে মা আছে, স্ত্রী আছে, দুটী ছোট ছেলে আছে, সন্তোষের কিছুরই অভাব ছিল না,—গৃহে সুখ, মনে শান্তি, গ্রামে খ্যাতি, নির্ম্মল চরিত্র, ঈশ্বরে ভক্তি সকলই ছিল। সব

থাকিলেও গিরিজার কারণ সময়ে সময়ে মনে অশান্তি আসিত।

গিরিজা সন্তোষের বাল্য-সুহৃদ্, উভয়ে শৈশবাবধি একত্র বেড়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে। তবে কিছুদিন উভয়ে ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। সন্তোষ, ডাক্তারি পড়িতে কলিকাতায় গেল—গিরিজা অর্থাভাব প্রযুক্ত যাইতে পারিল না। এই সময়, অর্থাৎ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গিরিজার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা, স্থানীয় জমিদারের সেরেস্তায় বার্ষিক ষাট টাকা বেতনে মুহুরিগিরি করিতেন। আয় সামান্য, বড় একটা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গিরিজা কুড়ি বৎসর বয়সে স্ত্রী ও বৃদ্ধা পিসিকে লইয়া সংসারে ভাসিল। পিতৃমাতৃকুলে তাহার আর কেহ নাই।

যাহাকে লইয়া আমাদের এ আখ্যায়িকা, তা'র কিছু পরিচয় প্রয়োজন। আমরা গিরিজার স্ত্রীর কথা বলিতেছি। তা'র নাম লাবণ্যবতী। সে বেশ সুন্দর;—সন্ধ্যাকালের আধফোটা মল্লিকা ফুলের ন্যায় তাহার মুখখানি অতি সুন্দর। লাবণ্য অলঙ্কার না পরিয়াও সুন্দর।

লাবণ্যর সন্তানাদি হয় নাই। নায়িকার সন্তান

থাকিলে লেখকদের একটু গোলে পড়িতে হয়। উপ-নায়িকার থাকিলে আপত্তি নাই, কিন্তু নায়িকার থাকিলে চলে না। তাই কমলমণিকে সন্তান লইয়া খেলিতে দেখিলাম, কিন্তু সূর্য্যমুখীর শ্রাদ্ধাধিকারী কাহাকেও দেখিলাম না। আমরা সূর্য্যমুখীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লাবণ্যকে অনায়িকোচিত কার্য্যে কিছুতেই সংলিপ্ত হইতে দিলাম না।

লাবণ্যর মা আছে, ভাই আছে। তা' লাবণ্য তাদের কাছে বড় একটা যায় না। যখন সময় ভাল ছিল, তখন মাঝে মাঝে মাকে দেখিতে যাইত। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া পিত্রালয়ে যাইতে লাবণ্য সঙ্কুচিতা; গিরিজাও পাঠাইতে নারাজ।

সংসার আর চলে না। পিতার মৃত্যুর দিন হইতে সংসারে অনাটন। দু'চার বিঘা যা জমী ছিল তা' বেচিয়া দু' বছর কোন রকমে চলিল। তৃতীয় বৎসর লাবণ্যর অলঙ্কারে হাত পড়িল। গহনাপত্র সামান্য, সত্বরই নিঃশেষিত হইল। তখন গিরিজার চমক ভাঙ্গিল, চাকুরি চাকুরি করিয়া দেশময় ছুটাছুটি করিল। জমিদারী সেরে-স্তায় চাকুরিও মিলিল—কিন্তু টিকিল না। কেন টিকিল না, তা' বলিতেছি।

গ্রামের জমিদারের নাম নলিনীপ্রসন্ন। তাঁর আয় সালিয়ানা আঠার হাজার টাকা। আয় সামান্য হইলেও প্রতাপ অপ্রতিহত। বয়স বড় বেশী নয়,—ত্রিশের মধ্যে হইবে। দেখিতে রূপবান্; তবে মুখে লাবণ্য নাই, শ্রী নাই। একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, যার মনোভাব কুৎসিত, তা'র মুখও কুৎসিত। যাই হউক, নলিনী বাবুর চম্পক গৌর বর্ণ দেখিলে তাঁহাকে কুৎসিত বলিতে পারা যায় না।

নলিনী বাবুর একটা গুরুতর দোষ ছিল;—তিনি রূপপ্রিয়। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেন, তাহা আনিয়া নিজের বিলাস-কক্ষ সাজাইতেন। উদ্যানে 'বসোরা' বা 'সুইট ব্রায়ার' ফুটিলে—গ্রামে সুন্দরী যুবতী বা যৌবনোন্মেষোন্মুখী বালিকা নজরে পড়িলে নিজের বিলাসকক্ষে সযতনে আনিতেন। ইহাতে লোকে বড় নিন্দা করিত। তা' লোকের কি ? তারা কা'র কুৎসা না করে ? সংসারে যে বড় হয়, তারই গ্লানি সকলের জিহ্বাগ্রে। শঙ্করাচার্য্য বা নেপোলিয়ঁ। কেহই অব্যাহতি পান নাই। তা' তাঁদের তুলনায় নলিনী বাবু—নিজে না মানিলেও—অতি তুচ্ছ।

লাবণ্যবতীর রূপের কথা অনুচরের মুখে শুনিয়া

নলিনী বাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, দেখিবার সুযোগ খুঁজিলেন। দেখাও মিলিল; তবে দূর হইতে। সুতরাং আশা ও প্রবৃত্তি কমিল না—বাড়িল। পুনরায় দেখিবার প্রত্যাশী হইলেন। বারম্বার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। তখন তিনি গিরিজাকে ডাকিয়া গোমস্তাগিরি দিলেন; এবং অদূর ভবিষ্যতে নায়েব করিয়া দিবেন, এরূপ আশাও দিলেন। কিন্তু নলিনী বাবু যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা মিলিল না,—তখন গিরিজা অপমানসহকারে বিদূরিত হইল।

নিঃসহায় নিঃসম্বল গিরিজানাথ অকূল সমুদ্রে ভাসিল। গৃহে অন্ন নাই—তহবিলে কপর্দ্দক নাই। অনাহারে মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর কি? কিন্তু নিয়তি মরিতে দিল না, —বাল্যসুহৃদ সন্তোষ কুমারকে আনিয়া দাঁড় করাইল। মহাপ্রাণ সন্তোষকুমার প্রফুল্লচিত্তে আহার্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সমস্তই সরবরাহ করিতে লাগিল। দান গৃহীত হইল বটে, কিন্তু গিরিজার প্রাণ ফাটিয়া গেল! তা'র জীবনে ধিক্কার জন্মিল;—অর্থচেষ্টায় সে প্রবাস যাত্রা করিল।

---

(৩)

তা'রপর পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে; কিন্তু গিরিজার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; গৃহ নিরানন্দ। ভার্য্যা লাবণ্যবতী বেশভূষা, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৃদ্ধা পিসি একবেলা দু'মুঠা রাঁধে, আর ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা কুটিয়া দিন কাটায়। সংসারে গিরিজার আর কেহ নাই; সুতরাং কাঁদিবে কে? এ পৃথিবী ত অনাথ কাঙ্গালের জন্য কাঁদে না,—আর কেহ না কাঁদুক—সন্তোষ কাঁদে; চারিদিকে পত্র লিখিয়াও সন্তোষ কুমার, বন্ধুর কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। আর কতদিন স্তোক দিয়া লাবণ্যবতীকে রাখা যায়? নিজের কাতর প্রাণের চীৎকার—রুদ্ধ আঁখিজল চাপিয়া কতদিন আর লাবণ্যকে সান্ত্বনা দিয়া রাখিতে পারা যায়? সন্তোষ ভাবিয়া চিন্তিয়া আজ একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লাবণ্যের নিকট সমুপস্থিত হইল। বলিল, "বউদিদি, আমি কলিকাতায় যাইব; তোমরা সাবধানে থাকিও।"

লাবণ্য। কেন যাইতেছ?

সন্তোষ। গিরিজা দাদার সন্ধানে।

লাবণ্য। কোথায় তাঁর সাক্ষাৎ পাইবে?

সন্তোষ। দেখি, কোথায় পাই।

লাবণ্য উত্তর করিল না,—মাটীর পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কত-দিন পরে ফিরিবে ঠাকুর পো?"

সন্তোষ। তা ভগবান্ জানেন; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তাঁর সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।

লাবণ্য আবার নিরুত্তর হইল। একবার আকাশপানে, একবার গাছের পানে, একবার সন্তোষের পানে চাহিল। অবশেষে বলিল, "ঠাকুর পো, তুমি যেও না।"

উত্তর না করিয়া সন্তোষ, লাবণ্যের পানে চাহিল; দেখিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত। সন্তোষ সকলই বুঝিল; "তা দেখা যাবে" বলিয়া চলিয়া গেল। পরদিন বৈকালে লাবণ্য সত্য সত্যই শুনিল যে, সন্তোষকুমার, স্ত্রী পুত্র জননী ভগ্নী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ-গমনোদ্যোগী হইয়াছে। লাবণ্য ব্যস্ত হইয়া সন্তোষকে ডাকিতে পাঠাইল। ডাকিতে আর কে যাইবে?—পিসি গেল। বুড়িকে পাঠাইয়া লাবণ্য ছাদে আসিয়া বসিল।

লাবণ্যদের বাড়ীখানি ক্ষুদ্র—একতল; সদরে একখানি খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ; ভিতরে একখানি খড়ের রান্নাঘর। তা'ছাড়া দু'খানি ইটের ঘর। এই ঘর দুই খানির ছাদ,

লাবণ্যের আরামের স্থান। সকালে বিকালে যখন অবকাশ পাইত, তখন সে ছাদে আসিয়া বসিত।

লাবণ্য যখন ছাদে আসিয়া বসিল, তখন অপরাহ্ণ। ছাদটি প্রাচীর-বেষ্টিত নয়। কিন্তু সড়ক হইতে ছাদের মানুষ দেখা যায় না—কেন না, বড় বড় গাছ অন্তরাল করিয়া প্রায় চারিধারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লাবণ্য ছাদে আসিয়া সন্তোষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বুড়ীও ফিরে না—সন্তোষও আসে না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এমন সময় নাপ্তিনী হরিমতী আসিয়া দেখা দিল। তাহার হাতে একটা বড় রকমের পুঁটলি। সে পুঁটলি নামাইয়া একটু হাসির সহিত বলিল, "কি গো ভাল আছ ত? তোমার পিশ্শাশুড়ী কোথায়?"

"তিনি ঠাকুরপোর বাড়ী গেছেন।"

নাপ্তিনী সাহ্লাদে দেখিল, গৃহে অপর কেহ নাই—পথ পরিষ্কৃত। তখন পুঁটলি খুলিতে খুলিতে একটু মধুর হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বল দেখি বউদিদি, তোমার জন্য কি এনেছি?"

লাবণ্য উত্তর করিল না। সে হরিমতীকে চিনিত—তাহার চরিত্রও জানিত। লাবণ্য কিছুকাল নীরব থাকিয়া

ঘৃণাভরে একবার তার পুঁটলির পানে চাহিল। হরিমতী কিন্তু কোন দিকে না চাহিয়া পুঁটলি খুলিল, এবং তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি একে একে বাহির করিয়া লাবণ্যের সম্মুখে সাজাইতে লাগিল।—চিরুণি ফিতা সাবান প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বাহির করিয়া লাবণ্যের সম্মুখে রক্ষা করিল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব এখানে রাখিতেছ কেন?"

নাপতিনী। এ সব তোমার—তোমার জন্য এনেছি।

লাবণ্য। আমার জন্য? আমিত তোমার কাছে কিছু চাহি নাই।

তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত অধরে একটু মধুর হাসি আনিয়া হরিমতী বলিল, "একজন তোমায় দিয়াছেন।"

লাবণ্য। কে দিয়াছেন?

নাপতিনী। যিনি দেশের রাজা।

লাবণ্য। জমিদার নলিনী বাবু?

নাপতিনী। হাঁ, তিনি এতদিন এখানে ছিলেন না, পীড়িত হ'য়ে পশ্চিমে হাওয়া খেতে গিছ্‌লেন; তাই এত কাল তোমার কোন খোঁজ নিতে পারেন নি। তাঁরে দয়া থাক্‌লে তোমার আর দুঃখ কি?

লাবণ্য। তিনি কেন আমায় এ সব জিনিষ দিয়াছেন ?

নাপতিনী। বোকা মেয়ে! বুঝ্‌তে পারছ না? তিনি তোমায় ভালবাসেন তাই দিয়েছেন। আমায়ও বয়সকালে কত লোকে কত কি দিয়েছে।

লাবণ্যর মনে বড়ই ঘৃণা জন্মিল। সে আজ দরিদ্র হইয়াছে বলিয়া এ উপহারের প্রলোভন! বর্দ্ধমান ক্রোধ দমন করিয়া লাবণ্য ধীরে ধীরে শান্তভাবে উত্তর করিল, "তোমার জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যিনি তোমায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বলিও যে, এরূপ নীচোচিত ব্যবহার দেশের জমিদারের নিকট আমরা প্রত্যাশা করি না। তুমি যাও—এ বাড়ীতে আর আসিও না।"

কথাগুলি শান্তভাবে বলিলেও দূতী রাগিয়া উঠিল। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমিদারের অপমান! তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান! কিন্তু দূতের রাগিলে চলে না।—ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হরিমতী অনেক বুঝাইল, জমীদারের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের দুই চারিটা গল্প বলিল; এবং তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলে লাবণ্যের পরিণাম কি ভয়াবহ হইতে পারে তাহাও ইঙ্গিতে জানাইল। কিন্তু কোন

ফল হইল না ; লাবণ্য বরং উত্তেজিত হইয়া নাপতিনীকে দুই চারিটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল।

নাপতিনী তখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল, এবং অকথ্য ভাষায় লাবণ্যকে শাসাইতে লাগিল। এমন সময় তথায় সন্তোষকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হরিমতী চুপ করিল। কিন্তু চুপ করিবার পূর্ব্বে তাহার দু'একটা কথা সন্তোষের কাণে গিয়াছিল। লাবণ্যর উত্তেজিত ভাবও সন্তোষের নয়নাকর্ষণ করিল। তিনি একটু সন্দিহান হইলেন। লাবণ্যর সম্মুখে দ্রব্যসম্ভার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে নাপতিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে?"

জমিদারের আশ্রিতা নাপতিনী নির্ভয়ে উত্তর করিল, "জমিদার বাবু।"

সন্তোষ বলিলেন, "তোমার জমিদারকে বলিও, তাঁহার প্রেরিত উপহার আমি পদাঘাতে দূর করিয়াছি।"

বলিয়া তিনি সত্যসত্যই দ্রব্যনিচয় পদাঘাতে দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। নাপতিনী ক্ষণকাল সন্তোষের

পানে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। সন্তোষ বলিলেন, "আর তুমি যদি কখন এ বাড়ীতে এস—"

পিছন হইতে পিসি বলিল, "তা হ'লে তোকে ঝাঁটা পেটা করব।"

নাপতিনী আর বিলম্ব করিল না,—দ্রব্যাদি সত্বর গুছাইয়া লইয়া জমিদার-ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। নলিনী বাবু তখন উদ্যানে বসিয়া নাপতিনীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সহজেই তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল। হরিমতী ঘটনাটি বেশ একটু বাড়াইয়া রসান চড়াইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া নলিনী বাবু ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব পণ— তাহাকে আমার করিব—ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পারি, তাহাকে এ উদ্যানে আনিব।"

ঠিক সেই সময়ে সন্তোষ, লাবণ্যকে বলিল, "বউদিদি, আমার যাওয়া হ'ল না; তবে তুমি যদি কিছু দিনের জন্য পিত্রালয়ে যাও, তবে আমি যাইতে পারি।"

লাবণ্য উত্তর করিল, "আর কোথাও যাব না—তাঁর প্রতীক্ষায় এইখানেই থাকিব।"

---

(৪)

লোকে ভাবে চাকুরিটা বুঝি কলিকাতার রাস্তায় পড়িয়া আছে, কুড়াইয়া আনিতে পারিলেই হইল। পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কয়টা লোক তাহা কুড়াইয়া লইতে সমর্থ? দেশময়, রাজ্যময় টাকা ছড়ান রহিয়াছে, কিন্তু সেই রৌপ্যরাশি উঠাইয়া ঘরে আনিতে কয়টা লোকের সামর্থ্য আছে? কয়টা লোকের সে অধ্যবসায়, সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে পুরুষকার আছে?

গিরিজানাথের সে অধ্যবসায় আছে কিনা জানি না, কিন্তু সে কোথাও চাকুরি জুটাইতে পারিল না। বাঙ্গালী চাকুরি ভিন্ন আর কি করিবে? গিরিজনাথ চাকুরি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিল না। কিন্তু চাকুরি কলিকাতার রাস্তা হইতে উঠাইয়া লইতেও পারিল না। তখন রাজধানী ছাড়িয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গেল।

সেখানেও বড় একটা সুবিধা করিতে পারিল না। কলিকাতায় এক ধনীর গৃহে কিছুদিনের জন্য মাষ্টারি করিয়া গিরিজা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল; অবশেষে তাহা নিঃশেষিত হইয়া আসিল। তখন চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে সে গৃহের

দিকে ফিরিতে লাগিল। পথের ধারে জামালপুরে একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে নামিল। সেইখানে ঘটনাক্রমে কারখানার জনৈক সাহেবের সুনজরে পড়িল। সেটা বড় তুচ্ছ কথা নয়। বাঙ্গালী যে জন্য লালায়িত, গিরিজা তাহা পাইল,—একটু চাকুরি, আর সাহেবের কৃপা। গিরিজার অবসন্ন হৃদয়ে আবার শক্তির সঞ্চার হইল,—সে মহানন্দে চাকুরিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন গিরিজা গৃহে পত্র লিখিল; সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, চাকুরি সংগ্রহ না করিয়া সংবাদ দিবে না। এক্ষণে স্ত্রীকে ও বন্ধুকে পত্র লিখিল। প্রত্যুত্তরে বন্ধু সন্তোষ কুমার লিখিলেন, "বউদিদিকে সত্বর লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে; যদি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইতে না পার, তাহা হইলে লিখিবে, আমি গিয়া রাখিয়া আসিব। কিন্তু এখানে কোন মতেই বউদিদিকে আর রাখা হইতে পারে না,—বানরের উপদ্রব হইয়াছে।" পত্রের মর্ম্ম গিরিজা বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

স্ত্রী লিখিল, "এতদিন পরে দাসীকে মনে পড়িল? যদি মনে পড়িল তবে চরণে স্থান দাও,—আমায় সত্বর লইয়া চল। যদি কাল আসিতে পার তবে পরশুর অপেক্ষা করিও না। সন্তোষ ঠাকুরপোরও তাই ইচ্ছা। জানইত

তাঁর মত আত্মীয়, আমাদের আর নাই। তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিও না।"

গিরিজানাথ মহাবিপাকে পড়িল। ছুটিয়া সাহেবের কাছে ছুটির জন্য গেল, সাহেব ছুটি দিলেন না; বলিলেন, "তুমি আজ কয় দিন মাত্র চাকরিতে ভর্ত্তি হইয়াছ, এরই মধ্যে ছুটি? সম্মুখে দুর্গা পূজা, তখন যাইও।"

গিরিজানাথ পূজার অবকাশের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু তখনও ছুটি মিলিল না,—বড় বাবু অন্তরায় হইলেন, গিরিজা অনেক কান্নাকাটি করিল, কিন্তু বাবুর দয়া হইল না। তখন গিরিজা, সাহেবকে গিয়া ধরিল। সাহেবের দয়া হইল,—তিনি তিন দিনের ছুটী দিলেন। কিন্তু সে হুকুম বড় বাবু চাপিয়া রাখিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, গিরিজানাথ পূজাবকাশে এক দিনের জন্যও ছুটী পাইল না। বারম্বার সাহেবকে ত্যক্ত করিতেও তাহার সাহস হইল না।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে গিরিজানাথ একদিন সুযোগ বুঝিয়া সাহেবকে ধরিল— তাহার স্ত্রীকে আনিতে চায় তাহাও সাহেবকে জানাইল। সাহেব বলিলেন, "তোমায় ত আমি কয়দিন পূর্ব্বে ছুটি দিয়াছি, বাবু।"

গিরিজা। সাহেব, আমি হুকুম পাই নাই।

সাহেব। আচ্ছা, আমি তদন্ত করিয়া দেখিব; যদি ছুটি না পাইয়া থাক, তোমায় আমি সাত দিনের ছুটি দিব।

পরদিবস অপরাহ্নে সাহেবের খোদ চাপরাশি ছুটির হুকুম লইয়া গিরিজার নিকট উপস্থিত হইল। গিরিজা মহা উল্লাসে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সে দিন চতুর্দ্দশী —পর দিবস শ্যামা পূজা।

---

(৫)

আজ শ্যামা পূজা। ইলাপুরে বড় ধূম। জমিদার-ভবনে প্রতিমা পূজা হয়। তদুপলক্ষে যাত্রা, নাচ, প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া জমিদারবাটীর দিকে ছুটিল; পূজা দেখিতে নয় —যাত্রা শুনিতে।

সন্তোষের বাড়ীতেও শ্যামা পূজা। কিন্তু সেখানে আড়ম্বর নাই। একখানি ক্ষুদ্র মৃণ্ময় প্রতিমা লইয়া এক জন বৃদ্ধ পুরোহিত উপবিষ্ট। পুরোহিত, পূজোপকরণ লইয়া ডাহিনে বামে সাজাইতে লাগিলেন। জবা, পদ্ম,

অপরাজিতা, শেফালিকা, বিল্বপত্র স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া আকুল।—দুই গণ্ড বহিয়া অজস্র-ধারে জল গড়াইতে লাগিল। বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিমা-চরণে ফুল বিল্বপত্র না দিয়া তৎসমুদয় ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কখন বা উন্মাদের ন্যায় স্বীয় মস্তকে বক্ষে চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। মৃণ্ময় প্রতিমা ভুলিয়া বৃদ্ধ ভক্তমানসপটে যে দেবীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই অর্চ্চনা করিতে উন্মত্ত। উপাসক কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী-চরণে নিবেদন করিলেন,—"মা, যে সঙ্কল্প হৃদয়ে ধরিয়া এই দ্বাদশ মাস নিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছি, আমার জ্ঞানমত শুদ্ধাচারে পূজা হোম শান্তি স্বস্ত্যয়ন চণ্ডীপাঠ করিয়া আসিতেছি, আমার সে সঙ্কল্প, সে বাসনা পূর্ণ করিয়া দেও মা!—সর্ব্ব আপদ্ শান্তিপূর্ব্বক সন্তোষ ও গিরিজার মিলন সঙ্ঘটিত করিয়া দাও, বরাভয়দায়িনি।"

সন্তোষকুমার, প্রতিমা পদতলে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "ভাগ্য-বিধাত্রি, যদি কায়মনোবাক্যে এই দ্বাদশ মাস তোমার আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আজ গিরিজার সহিত আমার সাক্ষাৎ

ঘটাইয়া দাও। জীবনে জ্ঞানতঃ কখন অধর্ম্মাচরণ, পরপীড়ন করি নাই; আমার ধর্ম্ম, আমার পুণ্য দিয়া গিরিজাকে রক্ষা কর—আমার কামনা পূরণ কর। তোমার চরণে প্রণাম করিয়া গিরিজার সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষায় চলিলাম, আমার কামনা যেন নিস্ফল না হয়।"

সন্তোষ উঠিল। তখন রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর।

---

(৬)

ছাদে বসিয়া লাবণ্য পূজার বাজনা শুনিতেছিল। এক এক বার উঠিয়া এ-দিক্ ওদিক্ দেখিতেছিল। আজ গিরিজার গৃহে ফিরিবার কথা। লাবণ্য ভাবিতেছিল, "তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'শ্যামা পূজার দিন গৃহে ফিরিব; যদি রাত্রি তৃতীয় প্রহরের মধ্যে না ফিরি তবে জানিবে আর দেখা হইল না।' দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; কই, তিনি ত এখনও আসিলেন না?"

পিসি এক পাশে শুইয়াছিল; সহসা বলিয়া উঠিল, "না বাপু, সন্তোষ এখনও এল না—আমি যাই, একবার ঠাকুরটা দেখে আসি—গিরিজার কল্যাণে পূজা মানত আছে দিয়ে আসি; আমি যাব, আর আসব।"

লাবণ্য। না, পিসি মা, ঠাকুরপো না এলে তোমার যাওয়া হ'তে পারে না ; আমি কি একা থাক্‌ব?

পিসি। সন্তোষের কিন্তু ভারি অন্যায়, সে জানে আমি পূজা দেখ্‌তে যাব।

লাবণ্য। ঠাকুরপোর অন্যায়? ঠাকুরপো বোধ হয় জীবনে কখন অন্যায় কাজ করেন নাই।

পিসি। তবে সে এখন এল না কেন?

লাবণ্য। হয়ত পূজা ফেলে আসতে পার্‌ছেন না। তুমি ত জানই, কি জন্য আজ এই পূজার আয়োজন। তোমারি মুখে শুনেছি, ঠাকুর পো বারমাস-ব্যাপী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। আজ ব্রত উদ্‌যাপন—একটু দেরি হচ্ছে বলে কেন তাঁকে দোষী কর?

পিসি। আহা সন্তোষ আমার সোণার চাঁদ—এমন ছেলে সংসারে হয় না—বাছা দীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে বেঁচে থাক্—

"কা'কে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছ পিসি মা?"

"কে, সন্তোষ এলি? আয় বাবা আয়।"

সন্তোষ উপরে উঠিয়া আসিয়া পিসিমার কাছে দাঁড়াইলেন। পিসি বলিল, "বাবা, তুমি একটু বসো, আমি একবার ঠাকুরটা দেখে আসি।"

সন্তোষ। যাবে যাও, কিন্তু শীঘ্র এস। এখনি গিরিজা দাদা আস্‌বেন।

পিসি রীতিমত কাঁদিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এমন দিন কি আমার হবে, গিরিজা আবার এসে পিসি বলে ডাক্‌বে।"

সন্তোষ। আজ তাঁকে আস্‌তেই হবে, কেহ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। পৃথিবী বৈরী হইলেও আজ তাঁতে আমাতে সাক্ষাৎ হবে। এই মাত্র আমি পূর্ণাহুতি দিয়ে আস্‌ছি—ললাটে আমার যজ্ঞফোঁটা—মাথায় জগদম্বার নির্ম্মাল্য—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ এখনও আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

এমন সময় দ্বারে শিকলের শব্দ হইল। সন্তোষ চমকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গিরিজা? —গিরিজাদাদা?"

পিসি বলিল, "গিরিজা কেন হ'বে? সে শিকল নাড়্‌বে না,—সে জানে বা'র হ'তে কেমন করে ভিতরের খিল খুল্‌তে হয়। যাই, আমি একবার চট্‌ করে ঠাকুর দেখে আসি।"

পিসি নামিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই নীচে হইতে ভয়-চকিত কণ্ঠে চীৎকার উঠিল, "বাবা গো!" সন্তোষ

ও লাবণ্য উভয়েই চিনিল, পিসির কণ্ঠস্বর; ব্যস্ত হইয়া উভয়ে ছুটিয়া নীচে চলিল। অর্দ্ধপথে পিসির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্তোষ ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, পিসিমা?"

পিসিমা ভয়রুদ্ধ কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবা—উপরে চল, বল্‌ছি।"

উপরে আসিয়া পিসি বলিল, "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—ডাকাতে বাড়ী ঘিরেছে। দোর খুলে যেমন ঠাকুর দেখ্‌তে যাচ্ছি, আর দেখি কিনা যমের মত দু'টো লোক লাঠী ঘাড়ে করে দাড়িয়ে আছে। কি হ'বে, বাবা? পাড়ায় ত লোক নেই, সব ঠাকুর দেখ্‌তে গেছে—বুড়া বয়সে কি ডাকাতের হাতে প্রাণটা দিতে হ'ল!"

বুড়ি নিজের চিন্তায় বিভোর। সন্তোষ কিন্তু আর একটা কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মনে স্বতঃই উদয় হইল, "যার মত দরিদ্র এ গ্রামে নাই, তার বাড়ীতে ডাকাতি কেন?" সন্তোষ ভাবিতে অবসর পাইলেন না। একটা লোক প্রাচীর উল্লম্ফনে গৃহপ্রাঙ্গণে পড়িল, এবং দ্রুতপাদবিক্ষেপে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া ছাদে আসিল। ছাদে একটা দীপ জ্বলিতেছিল; তদালোকে সন্তোষকুমার মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে চিনিলেন।—সে

জমিদারের বেতনভোগী জনৈক লাঠিয়াল। সন্তোষকে দেখিয়া লোকটা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য ; পর মুহূর্তে লাবণ্যর দিকে অগ্রসর হইল। সন্তোষ তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দস্যু, সন্তোষকে মারিতে উদ্যত হইল। ছাদে একটা পিত্তলের ঘটি পড়িয়াছিল, সন্তোষ একটু পিছাইয়া আসিয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন এবং লোকটার মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। দস্যু সশব্দে পড়িয়া গেল।

সন্তোষ তৎক্ষণাৎ লাবণ্যর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বউদিদি, এখন সঙ্কোচের সময় নয়—পালাতে হ'বে।"

লাবণ্য। পালাব না—তিনি যে আসিবেন।

সন্তোষ। এখন বাঁচিলে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা।

লাবণ্য। এত ভয়ই বা কিসের? ডাকাতেরা ত প্রাণে মারে না। না হয়, দু'চার খানা বাসন যা' আছে তাই নিয়ে যাবে।

সন্তোষ। এ ডাকাতি বাসনের জন্য নয়—এ ডাকাতি তোমার জন্য।

লাবণ্য। আমার জন্য?

সন্তোষ। হাঁ; ডাকাতের সর্দ্দার কে জান? স্বয়ং নলিনী প্রসন্ন।

লাবণ্যর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে বলিল, "মরিতে হয়, এইখানে মরিব, তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গিয়াছেন—এইখানে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, আমি এ স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

সন্তোষ। মৃত্যু ত সুখের! কিন্তু তুমি ভুল বুঝিতেছ, জমিদার তোমায় মারিতে আসে নাই, ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল, তখন সন্তোষ আর সঙ্কোচ না করিয়া লাবণ্যকে কাঁধের উপর ফেলিলেন, এবং লম্ফত্যাগে ছাদ হইতে ভূতলে পড়িলেন। পতন বেগে তাঁহার একটা পা ভগ্নপ্রায় হইল; সন্তোষকুমার তাহা গ্রাহ্য না করিয়া গুরুভার কাঁধের উপর লইয়া ছুটিলেন। কয়েকপদ ভূমি অগ্রসর হইতে না হইতে জনৈক দস্যু লাঠী-হস্তে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। সন্তোষ তখন লাবণ্যকে ভূপৃষ্ঠে নামাইয়া পশ্চাতে রক্ষা করিলেন; এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া দস্যুর সম্মুখীন হইলেন। দস্যুর লাঠী উঠিল—সন্তোষ আত্মরক্ষা করিবার অবসর পাইলেন না—বামহস্তের উপর লাঠী পড়িল। সন্তোষের হাত ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তিনি ছাড়িলেন না,—দক্ষিণ হস্তে

দস্যুকে আক্রমণ করিয়া ভূপাতিত করিলেন, এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, "বউদিদি, তুমি পালাও—আমরা রাস্তার ধারে আসিয়া পড়িয়াছি—তুমি সড়ক ধরিয়া ছুটিয়া আমার বাড়ীতে যাও।"

"তোমায় ফেলিয়া পালাইব না।"

"আমার জন্য কোন চিন্তা নাই—মায়ের নির্ম্মাল্য এখনও আমার মাথায়—কা'র সাধ্য আমায় মারে।"

এমন সময় একটা লাঠী মহাবেগে আসিয়া সন্তোষের মাথায় পড়িল। সন্তোষের মাথা ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। লাবণ্য চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

---

(৭)

লাবণ্যর চীৎকার শুনিয়া দুই ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল। তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে যাইতেছিল। একজনের হাতে একটা লণ্ঠন, অপরের মাথায় একটা ট্রাঙ্ক। যা'র হাতে লণ্ঠন, সে গিরিজা। পশ্চাতের ব্যক্তি জনৈক মোট-বাহক। উভয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দুইটা লোক দ্রুতপদে পলাইতেছে। গিরিজা তাহাদের কিছু বলিল না। আর একটু অগ্রসর

হইল; দেখিল, সর্ব্বনাশ!—সন্তোষের রক্তাক্ত দেহ ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছে—পার্শ্বে লাবণ্য বসিয়া কাঁদিতেছে।

গিরিজা, চেতনাহীন দেহ পরীক্ষা করিল; দেখিল, দেহে প্রাণ নাই। তখন গিরিজা শুষ্কচক্ষে মৃতকে সম্বোধন করিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিল। লাবণ্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি যদি আর একটু আগে আসিতে!"

গিরিজা শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিল, "নিয়তি, নিয়তি! কুলির ঘুম ভাঙ্গাতে দেরি হয়ে গেল।"

গিরিজা মৃতের পাশে শুষ্ক চক্ষে বসিয়া রহিল। লাবণ্য বলিল, "চল, ঘরে চল।"

গিরিজা উন্মাদের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল "ঘরে? আবার ঘরে? যে সন্তোষের মত বন্ধু হারাইয়াছে, তা'র আর ঘর নাই।"

লাবণ্য। ছি, অধীর হও কেন?

লাবণ্য গিরিজার হাত ধরিল। সে স্পর্শে গিরিজার দেহ শিহরিয়া উঠিল। তাহার আঁখি-পল্লবের বাধ ভাঙ্গিয়া অজস্রধারে অশ্রুধারা ছুটিল।

এই অশ্রুধারাই মুক্তি;—গিরিজা রক্ষা পাইল।

দীক্ষা।

—:o:—

(১)

"বউ মা, মঙ্গল ঘট পেতেছ গা ?"

"হাঁ মা, পেতেছি।"

এক মাসের ছুটী লইয়া অখিলচন্দ্র বাটী আসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ছুটী ফুরাইয়া গেল। ছুটীগুলা চিরদিন এমনই ফুরাইয়া যায়। আজ বেলা তিনটার সময় অখিলচন্দ্র কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিবেন। তাই স্নেহময়ী জননী পুত্রের শুভ কামনায় মাঙ্গলিক আচরণে ব্যাপৃতা; তিনি বধূ সন্ধ্যামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঘট পেতেছ গা ?"

বারিপূর্ণ একটি ঘটের মুখে একটি আম্রশাখা, দুটি বিল্বপত্র, দুটি সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া সন্ধ্যামণি উত্তর করিল,—"হাঁ মা, পেতেছি।"

পুত্র অখিলচন্দ্র পূর্ণকুম্ভের পাদমূলে প্রণাম করিয়া মাতার পদধূলি মাথায় লইলেন ; পরে স্নেহশীলা প্রেমময়ী পত্নীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন।

একটি পাঁচ বৎরের পুত্র, একটি দুই বৎসরের কন্যা, মায়ের হাত ধরিয়া বাপের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই—সব নীরব। অখিলচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

বালক বালিকার গণ্ডে নিঃশব্দে চুম্বন দিয়া অখিলচন্দ্র বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সন্ধ্যা—আমার সন্ধ্যা—"

সন্ধ্যামণি উত্তর করিল না,—স্বামীর মুখপানে চাহিয়া নীরব রহিল। অখিলচন্দ্র বলিলেন,—"আবার আমি শীঘ্র আসিব মণি, তোমায় ছেড়ে আমি কতদিন থাকিতে পারিব!"

চক্ষু মুছিয়া অখিলচন্দ্র বিদায় লইলেন।

অমাবস্যার অন্ধকাররাশি হৃদয়ে ধরিয়া সন্ধ্যামণি সেইখানেই বসিয়া রহিল। ভাবিল,—"চিরদিন ত এমনি ভাবে বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে আজ আমার প্রাণ

কাঁদে কেন? কি যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ কি হ'লো, ভগবান্!"

---

(২)

কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, অখিলচন্দ্র রোগশয্যায় শয়িত। বাড়ীতে হাহাকার উঠিল। অখিলের মা বৎসহারা গাভীর ন্যায় ঘরবার করিতে লাগিলেন। অবশেষে বধূমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া অখিলের কর্ম্মস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর যাইতে হইল না,—অবিলম্বে সংবাদ আসিল, অখিল প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! জননী কাত্যায়নী ধূলায় পড়িয়া উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন! পতিপ্রাণা সন্ধ্যামণি চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। হায়, এই আশঙ্কাতেই বুঝি সাধ্বীর প্রাণ পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিয়াছিল!

---

(৩)

তিনদিন পরে, সন্ধ্যামণির জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন সে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল।

দেখিল পুত্র কন্যা কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে। বাড়ীতে অনেক স্ত্রীলোক জমিয়াছে ; সকলেরই মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। বিস্মিত নয়নে সন্ধ্যা সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। তারপর সহসা বিদ্যুদ্বেগে সেই কথা—সেই সর্ব্বনাশের কথা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যা আবার চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

প্রতিবেশিনীদের যত্নে সন্ধ্যা অচিরে জ্ঞান লাভ করিল। তখন শাশুড়ী কাত্যায়নী বধূর মুখে জল দিয়া বলিলেন,—"উঠ বউমা, আজ তিনদিন মুখে জল দেও নাই। হায়, হায়, এমন কপালও মানুষের হয়।"

কাত্যায়নী কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছেলেটি মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মা উঠ, মা খাও।"

সন্ধ্যা উঠিল ; কিন্তু কেহই তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না। নিদাঘের জলভরা মেঘখণ্ডের ন্যায় সন্ধ্যা উঠিয়া গিয়া একটি জনশূন্যগৃহে কবাট বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত করিতে করিতে কহিল, "স্বামিন্, প্রভু, দেবতা, আজ তিন দিন দাসীকে ছাড়িয়া গিয়াছ। গিয়াছ, যাও—দাসীও তোমার পিছনে যাইতেছে। কিন্তু যে লোকে তুমি

গিয়াছ, সে লোকে আমি যাইতে পারিব কি?—সে লোকে যাইবার আমি কি উপযুক্ত? না,এখন আমি দেহ-ত্যাগ করিব না। আগে সাধনাবলে তোমার দর্শন পাইবার যোগ্য হই, তারপর এ মাটীর ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমার অনুসরণ করিব।"

সন্ধ্যা উঠিয়া বসিল। চোখের জল না মুছিয়া যুক্ত-করে বলিতে লাগিল, "তুমি আমার ইষ্টদেব, তুমি আমার ধর্ম্ম। আজ হ'তে যতদিন এ দেহ থাকিবে, ততদিন এই যোগ—এই ধর্ম্ম সাধন করিব। অন্তরীক্ষে কোথায় আছ প্রভু, আশীর্ব্বাদ কর, দাসীর সাধনা যেন সিদ্ধ হয়।"

সন্ধ্যা এবার চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

---

(৪)

দিন যেমন যায় তেমনই যাইতে লাগিল। তপনদেব আগে যেমন কিরণ ছড়াইয়া পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতেন, এখনও তেমনই করিয়া থাকেন। নিশীথে সুনীল আকাশে শশধর তেমনই হাসিয়া চারিদিকে মাধুর্য্য বিকীরণ করে। বাতাস তেমনই হেলিতে দুলিতে বহিয়া যায়। মানুষ তেমনই হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়।

কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। একজনের সর্ব্বনাশে স্বষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

অখিলচন্দ্র নাই, তবু একবৎসর কাটিয়া গেল, সময় দাঁড়াইল না—স্বষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। সব তেমনই চলিতে লাগিল, শুধু অভাগিনী সন্ধ্যামণি সধবার বেশ ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণীর বেশ পরিগ্রহ করিল। সন্ধ্যামণিতে আর যৌবনের চাঞ্চল্য নাই, চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়া এক্ষণে প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে,—যেন বৈশাখের জলঝড়ের পর দিগ্‌দিগন্তে গম্ভীর প্রসন্নতা আসিয়াছে। সন্ধ্যামণি সেই প্রসন্নতাটুকু বুকে ধরিয়া যোগিনী বেশে সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে বুঝি তাহার এত রূপ ছিল না। নিরাভরণা, শ্বেতবসনা, স্বামিধ্যাননিরতা সন্ধ্যার রূপ দিন দিন উছলিয়া উঠিতেছিল। কে বলে অলঙ্কারে রূপ বাড়ে?

সন্ধ্যা শ্বাশুড়ীর আদেশে সংসারের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত বটে, কিন্তু নিজের কাজ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইত না। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উদ্যানে উদ্যানে ঘুরিয়া পুষ্পচয়ন করিত। তারপর চন্দন ঘষিয়া লইয়া স্বামীর অর্চ্চনায় বসিত। যে দিন ফুল বেশী পাইত সে দিন একছড়া মালা গাঁথিয়া উদ্দেশে স্বামীকে পরাইয়া দিত।

এক একটি করিয়া ফুল লইয়া সকলগুলিই স্বামীর চরণোদ্দেশে অর্পণ করিত। ভগবান্‌কে একটিও দিত না,—সব কুড়াইয়া লইয়া স্বামীর উদ্দেশে অঞ্জলি দিত।

কখন কখন বা দিবা দ্বিপ্রহরে ছেলেদের আহারাদি করাইয়া সন্ধ্যা দ্বিতীয়বার পূজায় বসিত। কখন কখন বা তাহার পূজা করা হইত না,—কাঁদিয়াই ভাসাইয়া দিত। সে সময় তাহার মুদিত নয়নদ্বয় হইতে জলধারা গড়াইয়া যখন অঞ্জলিবদ্ধ পুষ্পনিচয় সিক্ত করিত, তখন যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইত, তাহা বুঝি আকাশের গায়, প্রকৃতির বুকেই শুধু চিত্রিত দেখা যায়। আবার সন্ধ্যা যখন সেই অশ্রুসিক্ত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পাঞ্জলি, মানসমন্দির-স্থাপিত পতি-দেবতার চরণোদ্দেশে স্ফীতবক্ষে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে অর্পণ করিত, তখন মনে হইত এ চিত্র বুঝি হিন্দুরমনীর হৃদয় ব্যতীত ত্রিভুবনে আর কোথাও চিত্রিত হইতে পারে না।

---

(৫)

"আমাকে কেন ডেকেছ মা ?"

"গুরুদেব, বড় বিপদে পড়েছি।"

"কি বিপদ ?"

"ছেলে হারিয়ে এখন ছেলের বউকে নিয়ে বিপদে পড়েছি।"

"বউকে নিয়ে বিপদ! সে কি মা?"

কাত্যায়নী চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিয়া উত্তর করিলেন, "বউ খায় না দায় না—সংসার দেখে না, ছেলে পিলের পানে ফিরে চায় না, কি এক রকম পাগলের মত হয়ে গেছে।"

গুরুদেব প্রকাণ্ড এক টিপ নস্য সশব্দে গ্রহণ করিয়া অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তর করিলেন, "বধূঠাকুরাণী শোকে অভিভূতা হইয়াছেন; ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।"

কাত্যা। কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

গুরু। মন্ত্র দিব।

কাত্যা। বেশ কথা; কবে দিবেন?

গুরু। আগামী কল্য শুভদিন আছে। উদ্যোগ আয়োজন কর গে।

গৃহিণী প্রফুল্লচিত্তে উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃতা হইলেন; কিন্তু সন্ধ্যাকে কিছু বলিলেন না।—সন্ধ্যাও কিছু জানিল না।

———

(৬)

পরদিন প্রভাতে সন্ধ্যা স্নান সমাপন করিয়া পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল। আজ ফুল অনেক ; সন্ধ্যা সাজি পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিল। পূজার ঘরে নিভৃতে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সন্ধ্যা মালা গাঁথিতে লাগিল। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে কণ্টক ও সূচিকায় তাহার হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইল, সে দিকে সন্ধ্যার দৃক্‌পাত নাই। সে একবার ফিরিয়াও দেখিল না, শুভ্রকায় মল্লিকার অঙ্গ রুধিররাগে কেমন রঞ্জিত হইয়াছে—রুধিরবরণ গোলাপ রক্তলিপ্ত হইয়া কেমন লালবসনা ঊষার ন্যায় দেখাইতেছে। সন্ধ্যা কোন দিকে মন দিল না,—স্বামীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে মালা গাঁথা শেষ করিল।

তারপর চন্দন ঘসা। চন্দন ঘষিতে ঘষিতে সন্ধ্যা সহসা যেন দেখিল, চন্দন পিঁড়িতে তাহার স্বামীর চরণ—চন্দন কাষ্ঠে স্বামীর চরণ—ঘর্ষিত চন্দনে স্বামীর চরণ। তাহার সমস্ত দেহ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে চন্দনঘষা ছাড়িয়া আকুলনয়নে চন্দনপিঁড়ি পানে চাহিয়া রহিল। চন্দন পড়িয়া রহিল—সযত্নগ্রথিত পুষ্পমালা, আয়াস-সঞ্চিত ফুলরাশি উপেক্ষিত হইল ; সন্ধ্যা নিবিষ্ট-চিত্তে অনন্যকর্ম্মা হইয়া চন্দনপিঁড়ি পানে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে চন্দনপিঁড়ি অন্তর্হিত হইল—শুধু চরণ রহিল। অবশেষে চরণও অদৃশ্য হইল। কিছুই রহিল না,—আকাশ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, ফুল চন্দন, স্বামিচরণ কিছুই রহিল না—সব কোথায় অদৃশ্য হইল।

সন্ধ্যা ভূম্যাসনে উপবিষ্টা, স্পন্দরহিতা, জ্ঞানশূন্যা। তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে—আলুলায়িত সিক্ত কেশরাশি ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছে। তাহার দেহ স্থির, নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত, শ্বাস রুদ্ধ, অধরোষ্ঠ বিযুক্ত। সন্ধ্যা যেন তাহার দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে সেই কক্ষে কাত্যায়নী ও তাঁহার গুরুদেব আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই দেখিলেন, সন্ধ্যার জ্ঞানশূন্য সমাধিস্থ দেহ। ফুল চন্দন মালা পড়িয়া রহিয়াছে—পূজার উপকরণ চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; মধ্যে স্থির নিষ্কম্প জ্ঞানবিরহিতা সন্ধ্যা। নয়নে পলক নাই, নাসিকায় নিশ্বাস নাই, দেহে স্পন্দন নাই। গুরুঠাকুর নীরবে নির্নিমেষলোচনে সন্ধ্যার পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু গৃহিণী ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না,—তিনি বধূর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বধূকে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিলেন। গুরুদেব ইঙ্গিতে গৃহিণীকে

সংযত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বধূ ধ্যাননিমগ্না—বিরক্ত করিও না।"

কথাটায় গৃহিণীর বিশ্বাস হইল না। কেননা, হরি নামের মালা হাতে করিয়া তিনিও অনেক জপধ্যান করিয়াছেন; কিন্তু এমন ধারা মরা মানুষের মত ভাব কখনও তাঁহার হয় নাই, বরং ধ্যানাবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি-শক্তি ও কার্য্যতৎপরতা এতই প্রবল হয় যে, তিনি মনে মনে সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসাব, বিড়াল কুকুরাদির শাসন পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হন। মরিয়া যাওয়া দূরে থাক্, তখন তিনি আরও সজীবতা লাভ করেন। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহিণী গুরুদেবের কথায় সন্দিহান হইলেন; কিন্তু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। কিছু না বলিয়া বধূমাতার পার্শ্বে বধূমাতার মুখপানে উৎসুক নয়নে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব ধীরে ধীরে উঠিলেন—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহবাহিরে আসিলেন, এবং ইঙ্গিতে শিষ্যাকে ডাকিলেন। শিষ্যা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন গুরুদেব মৃদু-স্বরে বলিলেন, "তোমার পুত্রবধূর দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সে কি ঠাকুর!"

গুরু। তিনি পূর্ব্বাহ্নে দীক্ষিতা হইয়াছেন।

গৃহিণী আঁচলটা উঠাইয়া লইয়া, একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"না ঠাকুর, বউমার মন্ত্র লওয়া হয় নি—আপনি জানেন না।"

গুরু। বিশ্বাস কর, আমি বল্‌ছি তোমার বউমার মন্ত্র লওয়া হইয়াছে।

কাত্যা। কে মন্ত্র দিল ঠাকুর? তুমি না আমি?

গুরু। কাহাকেও দিতে হয় নাই—তিনি আপনিই কুড়াইয়া পাইয়াছেন।

কথাটায় কাত্যায়নীর বিশ্বাস হইল না, গুরুদেব তাহা বুঝিলেন। তিনি বলিলেন,—"শুন মা, গুরুর কথায় অবিশ্বাস করিও না। আমি এ সত্তর বৎসর বয়সেও যাহা করিতে পারি নাই, এই ক্ষুদ্র বালিকা স্বল্পকাল মধ্যে তাহা করিয়াছে; এ তেজোদ্দীপ্তা বালিকার দীক্ষার প্রয়োজন নাই।"

কাত্যা। তবে শুন ঠাকুর, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বউমার পূজা অর্চ্চনা সকলি দেখে আসছি; আমি কখন তা'কে ঠাকুর-দেবতাকে ডাক্‌তে শুনিনি—কখন তুলসী গাছকে বা কালী জগন্নাথের পটকে প্রণাম কর্‌তে দেখি নি। যে এমন মূর্খ, ধর্ম্মহীন, আমি কেমন করে বল্‌ব ঠাকুর, তা'র দীক্ষা হয়েছে?

গুরু। তবে বল দেখি, তোমার বউমা চুপ ক'রে ব'সে থেকে কি করে?

কাত্যা। কি করে তা' আমি কেমন করে জান্‌ব? তবে বিড়্‌ বিড়্‌ করে বকে—মাঝে মাঝে 'স্বামী' 'স্বামী' ক'রে ডেকে উঠে; ভুলেও একবার 'হরি' 'হরি' করে না। এক গাছা তুলসীর মালা গোপীনাথের পায়ে ঠেকিয়ে এনে দিলাম, তা' বউ যদি ভুলেও একবার মালা হাতে ক'রে বসে।

গুরু। তোমার বউ জপতপের অতীত; ন্যাস, প্রণাম, প্রণব, কর্ম্ম তোমার আমার জন্য—সম্মুখে যা'কে সমাধিস্থ দেখছ, তার জন্য নয়। বুঝেছ?

কাত্যা। কই আর বুঝলুম? যে মেয়ে, ঠাকুর দেবতার নাম ছেড়ে আজীবন 'স্বামী' 'স্বামী' করে কাটালে, তা'র ধর্ম্ম আমার ধর্ম্মের চেয়ে বড় হল? তুমি কি বল্‌ছ ঠাকুর?

গুরু। তুমি বিস্মৃত হইতেছ মা, স্বামিপূজাই নারীজন্মে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কুন্তলা। *

(১)

শান্তিপুরের রাস্তা বহিয়া শত শত নরনারী গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। আজ মহাবিষুব সংক্রান্তি। মহা পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য। ঘাট আলো করিয়া কত হিন্দুরমণী পুণ্যলাভার্থ গঙ্গায় ডুব দিতেছে। কেহ সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতেছে, কেহ বা "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে" বলিয়া গঙ্গার স্তব করিতেছে। যে স্তবস্তোত্র জানে না, সে শুধু "মা গঙ্গা" "মা গঙ্গা" বলিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে। এমন সময় রমণীমহলে একটা মহা গোল পড়িয়া গেল।

ঘাটের একধারে একটি যুবতী স্নান করিতেছিল।

---

* গল্পের মূলাংশ সত্য। যাঁহাকে সেবাইত বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তিনি লেখিকার পিতা—স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়।

সে বেশ্যা—নাম কুন্তলা। অনেকেই তাহাকে চিনিত, চিনিবার একটু কারণও ছিল। যে পাড়ায় কুন্তলা বাস করে, সেই পাড়ার অধিকাংশ স্ত্রীলোক এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছে। এক্ষণে এই মহাপুণ্যদিনে গৃহস্থ-রমণীর সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাকে স্নান করিতে দেখিয়া সতীত্বতেজোদৃপ্ত সাবিত্রী-প্রতিম ললনাকুল ক্রোধে ও ঘৃণায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। যিনি স্তব আবৃত্তি করিতেছিলেন. তিনি স্তব বন্ধ রাখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "অ। মোলো, মাগী আবার এ ঘাটে মর্‌তে এসেছে।" যিনি সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে-ছিলেন, তিনি প্রণামটা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সূর্য্যবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সরে যা মাগী, দেখ্‌ছিস্ না আমরা চান্ কর্‌ছি।

কুন্তলা বেশ্যা—অনপনেয় পাপে কলঙ্কিতা। তবে সে গঙ্গাস্নানে আসে কেন? জাহ্নবী-সলিলে কি বেশ্যার পাপ বিধৌত হয়? বুঝি হয়; দুই নয়নের যমুনা-সরস্বতী-প্রবাহ জাহ্নবী-স্রোতে মিশাইতে পারিলে বুঝি বেশ্যার পাপও ধুইয়া যায়।

যাক্ বা না যাক্, কুন্তলা প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে আসে। আজও আসিয়াছিল; কিন্তু এরূপ তীব্র তিরস্কার তাহাকে

ইতিপূর্ব্বে সহ্য করিতে হয় নাই। তবু সে বিচলিত হইল না। ধীরে ধীরে স্নান সমাপন করিল; এবং পিত্তলময় কলসী জলপূর্ণ করিয়া ঘাটের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একধারে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া গঙ্গাপানে চাহিয়া প্রণাম করিল। তারপর কাল মেঘের মত নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠের উপর এলাইয়া দিয়া সিক্ত বস্ত্রে অনাবৃত মস্তকে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল।

---

(২)

গঙ্গার ঘাট হইতে তাহার গৃহ অনেকটা পথ—এক ক্রোশের উপর। পথে আসিতে আসিতে সে ভাবিল, “সকলে ঠাকুরকে জল দিয়া আসে; আমি কেন দিয়া আসি না? আমার জল কি ঠাকুর গ্রহণ করিবেন না? না করেন, আমি তাঁহার দালান ধুইয়া দিয়া আসিব। তা'তেই বা আমার অধিকার কি? আমার ছোঁয়া জল হাড়ি ডোমেরও গায়ে লাগিলে তাহারা অপবিত্র হয়, তবে দালান বা রোয়াক ধোয়ার আমার অধিকার কি? দেখি, গোপীনাথ ধুইতে দেন কি না।” কথাটা ভাবিতে

ভাবিতে কুন্তলা পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল।

শান্তিপুরের এক প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র পল্লী আছে,—নাম নূতনপাড়া। এই পল্লীর প্রান্তভাগে কুন্তলার পর্ণকুটীর। কুটীর সন্নিকটে প্রসিদ্ধ গোপীনাথের মন্দির।

কুন্তলা গৃহে না গিয়া জলপূর্ণ কলসী-কক্ষে গোপীনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবালয়ে প্রবেশ করিতে অথবা সিঁড়িতে উঠিতে সাহস পাইল না;—প্রাঙ্গণের একধারে আসিয়া দাড়াইল। উদ্দেশ্য—কলসীর জল লইয়া মন্দিরের দালান ও রোয়াক ধুইয়া দেয়; কিন্তু সাহস হইল না। সে যে বেশ্যা—তাহার স্পৃষ্ট জল যে অপবিত্র। কুন্তলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নীরবে একধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

একজন ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক সম্মার্জ্জনী হস্তে মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছিল। সে কুন্তলাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ্ করে দাড়িয়ে রইলি কেন? সরে যা—ঝাঁট দিই।" কুন্তলা সরিয়া আর একধারে দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকটা বলিল, "তুই চাস্ কি?"

কুন্তলা উত্তর করিল, "আমার এই জল কলসীটা—" আর বলিতে পারিল না—বলিতে সাহসও করিল না।

"তোর জল কলসীটা নিয়ে হবে কি?—ঠাকুরকে চান্ করাতে চাস্?"

"না।"

"তবে?"

"দালান রোয়াক ধুইতে চাই।"

"আ মোলো, মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ। আমাদের ছোঁয়া জলই মন্দিরে উঠ্‌তে পায় না, উনি আবার জল নিয়ে দালান ধুতে এসেছেন। বেরো মাগী, এখান থেকে।"

পুরোহিত মহাশয় তখন দালানে বসিয়া নিমীলিত নয়নে ধূমপান করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের কতকাংশ তাঁহার কাণে গেল। তিনি চক্ষু খুলিয়া উঠানের দিকে দেখিলেন; এবং অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে?"

সম্মার্জ্জনী-ধারিণী উত্তর করিল, "হবে আবার কি? বেশ্যা মাগী জল এনেছে—বলে কিনা ঠাকুরের দালান ধোব।"

ঠাকুরের প্রতিনিধি—পুরোহিত মহাশয়—কুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার স্পৃষ্ট জলে কোন

কার্য্য হইতে পারে না; এমন কি উঠান ধোয়াও চলিতে পারে না—কি জানি শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ তাহা স্পর্শ করে।"

কুন্তলা নতমুখে পুরোহিতের আদেশ শুনিল। তারপর ধীরে ধীরে বিমর্ষ অন্তরে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া মন্দিরের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া একবার একটু ভাবিল; তারপর চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল।—কেহ কোথাও নাই। তখন সে জানু পাতিয়া ভূপৃষ্ঠে উপবেশন করিল; এবং কলসীর সমুদয় জল ঠাকুরের উদ্দেশে সম্মুখস্থ ভূখণ্ডের উপর ধীরে ধীরে ঢালিল। তারপর সেই বারিসিক্ত ধূলি লইয়া ললাটে ও জিহ্বায় দিল; এবং উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শূন্য কলসী-কক্ষে গৃহে ফিরিল।

---

(৩)

বৎসর ঘুরিয়া আবার মহাবিষুব সংক্রান্তি আসিয়াছে। কুন্তলা এই বৎসরেক কাল প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইত; এবং জাহ্নবী-সলিলে কলসী পূর্ণ করিয়া গোপীনাথের মন্দির-পশ্চাতে বসিয়া কলসীর জল ঠাকুরের উদ্দেশে মৃত্তিকায় ঢালিত।

আজ আবার বৎসর ঘুরিয়া সেই মহাপুণ্য দিন আসিয়াছে। কুন্তলা প্রভাত হইতে না হইতে গঙ্গাস্নানে চলিল; এবং পবিত্র জলে কলসী পূর্ণ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। কুন্তলা গৃহে গেল না, মন্দির-পশ্চাতে আসিয়া জলও ঢালিল না,—ব্যাকুল হৃদয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বাসনা—একবার ঠাকুর-দর্শন। দালান বা রোয়াক ধুইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে আর রাখে না,—শুধু একবার দূর হইতে দেবতার দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিতে চায়। বৎসরেক পূর্ব্বে এমনি দিনে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সে একবার দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিল; সেই একবার দেখিয়াই নবজলধর শ্যামের বংশীবাদন মোহনমূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়াছিল। তদবধি এই বৎসরেক কাল সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া মন্দির-পশ্চাতে আম্রবৃক্ষতলে জানু পাতিয়া জল ঢালিয়া আসিতেছে। আজ আবার ধ্যানে আঁকা সেই শ্যামমূর্ত্তি নূতন করিয়া দেখিবার বাসনা হৃদয়ে ধরিয়া আসিয়াছে। দেখা কি মিলিবে না?

তখনও মন্দির-দ্বার খোলা হয় নাই। পুরোহিত মহাশয় স্নানে গিয়াছেন। কুন্তলা কলসী কক্ষে একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল।

ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কলসী মাটিতে নামাইতে পারে না—শূন্যও করিতে পারে না। সে স্থির করিয়াছিল, "আজ ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে দূরে দাড়াইয়া এই কলসীর জল ঠাকুরের চরণোদ্দেশে ঢালিব।" কিন্তু ঠাকুরের যে দর্শন মিলে না। কুন্তলার কক্ষ অবশ হইয়া আসিল। সে সকাতরে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করিল, "আর যে পারি না, ঠাকুর! একবার মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন দেও।"

এমন সময় গোপীনাথের সেবাইত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভদ্রাসন-বাটী মন্দিরের সন্নিকট—প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে; কিন্তু তিনি সকল সময় শান্তিপুরে থাকিতেন না—মধ্যে মধ্যে আসিয়া ঠাকুরের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। সম্প্রতি তিনি সপরিবারে গৃহে আসিয়াছিলেন।

সেবাইত আসিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণের একধারে একটি স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে দাড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি—সেবাইত কুন্তলাকে চিনিতেন না। কিন্তু কুন্তলা তাঁহাকে চিনিত, এবং ভক্তিও করিত। তিনি পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ—প্রাচীন

ও প্রবীণ—সরল ও উদার। যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই তাঁহাকে ভাল বাসিত।

কুণ্ডলা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সংস্পর্শে আসে নাই, দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছিল মাত্র। এক্ষণে সেই শুভ্র-শ্মশ্রু-সমন্বিত দেবকান্তি সম্মুখে দেখিয়া ভক্তিপ্লুত চিত্তে নীরব রহিল। প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া সেবাইত মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও বাছা?"

কুণ্ডলা তথাপি নীরব। সেবাইত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরকে জল দিতে এসেছ?"

"না।"

"তবে কি?

"ঠাকুরকে একবার—"

"দেখিতে চাও?"

"হাঁ।"

"আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।" বলিয়া তিনি দ্রুত-পদে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেন, এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "উপরে উঠিয়া এস।"

কুণ্ডলা ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে ব্যগ্রভাবে সিঁড়ি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। উপরে উঠিল না—নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেবাইত পুনরায় ডাকিলেন,—"উপরে এস।"

কুন্তলার আকুল বাসনা, উপরে উঠিয়া, ঠাকুরের নিকটে দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে দর্শন করে; কিন্তু সে প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া কুন্তলা অবনত মস্তকে ধীরভাবে উত্তর করিল, "উপরে উঠিবার আমার অধিকার নাই।"

সেবা। কেন অধিকার নাই, বাছা? যাহার ঠাকুর-দর্শনেচ্ছা এত বলবতী, তাহার সকল অধিকার আছে।

কুন্তলা। আমি—আমি—

সেবা। তুমি কি?

কুন্তলা। আমি বেশ্যা।

সেবা। তুমি বেশ্যা নও, তুমি ঠাকুরের ভক্ত। —স্বচ্ছন্দে উপরে উঠিয়া এস।

কুন্তলা ঠাকুরের ভক্ত! সে ত এ কথা জানিত না। তাহার দেহমধ্যে তাড়িত ছুটিল। সে আর দ্বিধা করিল না. সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া রোয়াকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

---

(৪)

এমন সময় পুরোহিতের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। কুন্তলাকে রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া

থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্তোত্র বন্ধ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, "আ গেল রে, মাগী রোয়াকের উপর উঠেছে। আস্পর্দ্ধা দেখ—নেমে যা বল্‌ছি।"

কুন্তলার আনন্দ, সাহস মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইল; সঙ্কোচ, দ্বিধা আসিয়া তাহার হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিল। সে প্রস্থানোদ্যতা হইল। সেবাইত মন্দিরগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করিতেছেন কেন?"

পুরো। দেখুন না, মাগী রোয়াকের উপর উঠেছে।

সেবা। তাহাতে অপরাধ কি হ'য়েছে?

পুরো। মাগী যে বেশ্যা।

সেবা। বেশ্যার পক্ষে কি ঠাকুরদর্শন নিষিদ্ধ?

পুরো। দর্শন নিষিদ্ধ নয়—কিন্তু স্পর্শন নিষিদ্ধ।

সেবা। কে আপনাকে এ কথা বলিল? পীঠ-স্থানে লোকে কি করে?

পুরো। পীঠস্থানের পক্ষে কোন নিয়ম নাই।

সেবা। কোন মন্দিরেও সে নিয়ম নাই। আমার বিশ্বাস—ম্লেচ্ছ-স্পর্শেও দেবতা অপবিত্র হন না।

পুরো। তবে অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন?

সেবা। সেটা আপনার জন্য—ঠাকুরের জন্য নয়। লোকে ঠাকুরকে শুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়া নিজের মন শুদ্ধ করে। যিনি দেবতা—পরমাত্মার গোচরীভূত, তিনি কিছুতেই অপবিত্র হ'ন না। সে যাই হউক, স্ত্রীলোকটি ঠাকুরকে স্পর্শ করে নাই; রোয়াকের উপর উঠিয়াছে মাত্র, তাহাতেই কি মন্দির অপবিত্র হ'ল?

পুরো। তা' হ'ল বই কি?

সেবা। আপনি কি এই জাগ্রত দেবতা গোপীনাথের সম্মুখে দাড়াইয়া বলিতে পারেন, আপনি বা আমি এই মন্দিরে দাঁড়াইয়া মন্দির অপবিত্র করিতেছি না?—আপনি বা আমি কি এই বেশ্যার ন্যায় পাপাক্রান্ত নই? যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে সত্য বলুন দেখি।

পুরোহিত মহাশয় এবার নিরুত্তর রহিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, কুন্তলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই মাগী কি দালান ধুতে আবার এসেছিস্? যেখানে রোজ জল ঢালিস্, সেইখানে জল ঢাল্‌গে যা।"

সেবাইত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় রোজ জল ঢালে?"

পুরো। মন্দিরের পিছনে।

সেবা। চলুন—দেখিগে।

উভয়ে নামিয়া মন্দির-পশ্চাতে আসিলেন। তথায় একটি স্বল্পায়তন গর্ত্ত দৃষ্ট হইল। গর্ত্তের তলদেশে কিছু জল জমিয়া রহিয়াছে। এই গর্ত্ত দেখাইয়া দিয়া পুরোহিত বলিলেন, "বেশ্যা মাগী প্রত্যহ এইখানে জল ঢালে।"

সেবা। জল কোথা হ'তে আনে?

পুরো। কে জানে কোথা হ'তে আনে। লোকে বলে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে এসে, এইখানে মাগী জল ঢালে।

সেবা। গঙ্গাজল ঠাকুর-পূজার জন্য দেয় না কেন?

পুরো। বেশ্যা-স্পৃষ্ট জলে ঠাকুর-পূজা হ'বে? এক বৎসর আগে এমনি দিনে সে দালান ধুতে এসেছিল, তাই ধুতে দিই নি—তা'র জলে আবার পূজা কর্‌ব?

সেবা। আপনি না করেন, আমি কর্‌ব।

বলিয়া তিনি মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় কুন্তলা রোয়াকের উপর অধোমুখে কলসী-কক্ষে তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সেবাইত তাহাকে বলিলেন, "তুমি জল লইয়া ঠাকুর ঘরে এস।"

কথাটায় কুন্তলার বিশ্বাস হইল না। সে পিছন ফিরিয়া দেখিল—অপর কাহারও উদ্দেশে কথাটা বলা হইয়াছে কিনা। দেখিল, পিছনে কেহ নাই। তখন

সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সেবাইতের পানে চাহিল। সেবাইত পুনরায় বলিলেন, "ঠাকুর ঘরে জল লইয়া এস।"

কুন্তলা তখন দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া দালানে আসিয়া দাড়াইল। এই দালান তাহার তীর্থক্ষেত্র। এখানে সে পূর্ব্বে কখন আসিতে পায় নাই। যাহারা এই দালানে দাঁড়াইয়া ঠাকুরদর্শন করিত, তাহাদের সৌভাগ্য কামনা করিয়া কুন্তলা কতদিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। আজ কুন্তলা সেই দালানে।

কুন্তলা ঠাকুর ঘরে গেল না। দালানের একাংশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া জলের ঘড়া রাখিল। সেবাইত মহাশয় তাহা উঠাইয়া লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; এবং ক্ষণকাল মধ্যে শূন্য কলসী হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কুন্তলা ধূলার উপর লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। যখন সে উঠিয়া বসিল, তখন তাহার গণ্ড ও বক্ষ বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিতেছিল। সেবাইত তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে ভক্তি লইয়া ঠাকুরদর্শন করিতে আসিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সে ভক্তি অক্ষয় হউক। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ঠাকুরের উদ্দেশে যেখানেই কেন জলধারা ঢাল না, ঠাকুর তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। ঠাকুরের পিছন নাই—সম্মুখ নাই। তিনি ব্রাহ্মণ-

শূদ্র, গঙ্গোদক-পঙ্কিলবারি ভেদাভেদ করেন না। তিনি শুধু হৃদয় চান। তুমি তাঁহাকে হৃদয় দান কর—পাপের জন্য কাঁদ, তোমার সকল পাপ ধু'য়ে যাবে।"

সেবাইতের চরণে প্রণাম করিয়া কুন্তলা গৃহে ফিরিয়া আসিল।

---

(৫)

গৃহের প্রাঙ্গণে আম্রবৃক্ষ তলায় বসিয়া একজন যুবা পুরুষ হুকাহস্তে তামাকু সেবন করিতেছিল। সে কুন্তলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত দেরী কেন গো?"

কুন্তলা সে কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার শেষ নাই—বিরাম নাই,—মুখে কাপড় গুঁজিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনোমধ্যে কেবল জাগিতেছিল, "পাপের জন্য কাঁদ, তোমার সকল পাপ ধু'য়ে যাবে।" কুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের উদ্দেশে মনে মনে বলিল, "ঠাকুর, আজীবন নিরন্তর কাঁদিব—কাঁদিয়া বুকের রক্ত চক্ষু দিয়া বাহির করিব, আমার পাপ ধু'য়ে দেও, দয়াময়!"

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। কুন্তলা চমকিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং আত্মসংযম করিয়া চক্ষের জল মুছিল। কুন্তলা দ্বার খুলিল না,—স্থির হইয়া শয্যার উপর বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। দ্বারে উপর্য্যুপরি করাঘাত হইতে লাগিল, কুন্তলা সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না। অবশেষে মনোমধ্যে একটা সঙ্কল্প আঁটিয়া কুন্তলা দ্বার খুলিল।

দ্বারদেশে সেই যুবাপুরুষ হুঁকা হস্তে দণ্ডায়মান। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার বুঝি কাঁদ্‌ছিলে কুন্তলা?"

কুন্তলা কোন উত্তর করিল না। যুবক বলিল, "কেন নিরন্তর কেঁদে কেঁদে দেহপাত করছ, কুন্তলা?"

কুন্তলা। দেহ রাখিয়া সুখ কি?

যুবক। সুখ? যতদিন পৃথিবীতে থাকা যায় ততদিনই সুখ।

কুন্তলা। ততদিনই দুঃখ—নিরন্তর স্মৃতির যন্ত্রণা।

যুবক। তুমি আমার সহিত গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছ বলিয়া কি তোমার যত দুঃখ? তাই কি তুমি প্রতিনিয়ত কাঁদ? আগে ত এমন করিতে না—বৎসরাবধি তোমার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। সত্য করিয়া বল কুন্তলা, কি করিলে আবার তেমনটি হয়?

কুন্তলা। তেমনটি আর কিছুতেই হয় না, সরোজ-কুমার। যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা কেহ আমাকে আর ফিরাইয়া দিতে পারে না।

যুবক। পারুক বা না পারুক, বল দেখি তুমি কাঁদ কেন?

কুন্তলা। কাঁদি কেন? বুক চিরিয়া না দেখাইলে ভাষায় তাহা বুঝাইতে পারি না।

যুবক। কুন্তলা, আমিই তোমার যত দুঃখের মূল। তুমি সুখে পিতা মাতা, রাজৈশ্বর্য্য লইয়া সংসার করিতে-ছিলে। আমি কুক্ষণে তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভালবাসিলাম। শুধু ভালবাসিয়া যদি নিবৃত্ত থাকিতাম, তাহা হইলেও তোমার হৃদয়ে আজ এ অনল জ্বলিত না।—তোমাকে আমার ভালবাসা জানাইলাম—তুমিও আমার মাথা খাইয়া আমাকে ভালবাসিলে। কুন্তলা, বল—কি করিলে তুমি আবার সুখী হও?

কুন্তলা। তুমি তাহা করিবে?

যুবক। করিব—প্রাণ দিলেও যদি তুমি মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হও, তাহাও আমি করিব।

কুন্তলা। তবে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে গৃহে ফিরিয়া যাও।

যুবক। গৃহে আমার কে আছে, কুন্তলা?

কুন্তলা। গৃহে তোমার স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সকলি আছে।

যুবক। কিন্তু কুন্তলা নাই।

কুন্তলা। কুন্তলা পাপ—স্ত্রী পুণ্য। এতদিন পাপের সেবা করিলে, এক্ষণে পুণ্যের সেবা করগে।

যুবক। কুন্তলার তুলনায় স্ত্রী!

কুন্তলা। স্ত্রীর চরণতলে শত শত কুন্তলা গড়াগড়ি যাইতেছে; একবার ফিরিয়া গিয়া দেখ দেখি।

যুবক। কুন্তলা, তুমি এত নিষ্ঠুর হইতে পারিবে, আমি জানিতাম না।

কুন্তলা। কুন্তলা আর নাই—কুন্তলা মরিয়া গিয়াছে।

যুবক। তুমি যে পথে যাইতে চাও, আমাকেও সেই পথে সঙ্গী করিয়া লও;—তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।

কুন্তলা। যে সুখের আশায় আমার সংসর্গ কামনা করিতেছ, সে সুখ আর পাইবে না। তোমার সুখ, স্ত্রীসংসর্গে—আমার সুখ, স্বর্গগত স্বামীর চরণ-তলে। পথ বিভিন্ন—আমাকে ত্যাগ করিয়া গৃহে যাও, নতুবা—

যুবক। নতুবা কি করিবে, কুন্তলা?

কুন্তলা। নতুবা আমি গৃহত্যাগ করিব।

যুবক। এত ভালবাসার এই প্রতিদান?

কুন্তলা। আমার কাছে তোমার ভালবাসার আর মূল্য নাই।

যুবক। কুন্তলা, কুন্তলা, এতদিনের পর আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিল।

কুন্তলা আর সেখানে দাঁড়াইল না—স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

---

(৬)

তারপর এক বৎসর অতীত হইয়াছে। কুন্তলা এখন একা। আপন মনে গৃহকর্ম্ম করে—আর ভাবে। গৃহ-কর্ম্মের শেষ আছে—কিন্তু ভাবনার শেষ নাই। অকূল ভাবনারাশি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া বারিভরা গম্ভীর মেঘ-খণ্ডের ন্যায় কুন্তলা ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুন্তলা পূজা করে না—জপতপ কিছুই করে না; সে শুধু এক কলসী গঙ্গাজল গোপীনাথের মন্দিরে দিয়া আসে। এইখানেই তা'র সকল কার্য্যের অবসান।

নিশীথে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমাইত, তখন কুন্তলা নীরবে উঠিয়া গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইত; এবং

ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিত। তা' সে প্রত্যহ যাইত,—শীত, বর্ষা কিছুই মানিত না।

কুন্তলা কাহারও গৃহে যাইত না—কেহ তাহার গৃহে আসিত না। কুন্তলা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিত না—কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে উপযাচক হইত না। সে একা কাঁদিত। সপ্তাহে একদিন বাজারে যাইত। চাল ডাল যাহা কিছু কিনিয়া আনিত, তাহাতেই সে কোন প্রকারে দিন কাটাইত। চাল, ডাল, লবণ, তৈল ছাড়া আর কিছু খাইত না—খাইবার প্রবৃত্তিও ছিল না।

কুন্তলার রূপযৌবন দুই-ই ছিল। যেখানেই রূপ-যৌবন সেই খানেই বিপদ্। কেহ কেহ তাহার পাছু লাগিয়াছিল। কুন্তলা একদিন স্বহস্তে তাহার নিবিড় কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল,—তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা গণ্ড, বক্ষ পুড়াইয়া দিল। তদবধি কোন পুরুষ তাহার পানে ফিরিয়া চাহিত না।

কুন্তলার কিছু অর্থ ও অলঙ্কার ছিল। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় তাহা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিত। এই অর্থ পাপ-উপার্জ্জিত নয়,—পিতৃভবন ত্যাগ-

কালে সঙ্গে আনিয়াছিল। তবু কুন্তলা ঠাকুরের সেবায় তাহা ব্যয় করিতে সাহস পাইত না।

কুন্তলা একদিন দূরে দাঁড়াইয়া গোপীনাথের পূজা দেখিতেছিল। যখন দেখিল, তাহার চয়িত পুষ্প-মধ্যে ঠাকুরের চরণ দুইখানি লুক্কায়িত হইল, তখন সে ভক্তি ও আনন্দে অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—ঠাকুরকে প্রণাম করিল না—একবার "গোপীনাথ" বলিয়া ডাকিল না, শুধু কাঁদিতে লাগিল। পূজার এই স্মৃতিটুকু লইয়া আনন্দ-বিহ্বল-চিত্তে কুন্তলা কতদিন কাটাইল।

কুন্তলা প্রত্যহ ঠাকুরের পূজার্থে গঙ্গাজল দিয়া আসিত—ফুল পাইলে ফুল দিয়া আসিত, কখন কখন বা মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে দিয়া আসিত। পুরোহিত এখন কোন আপত্তি করেন না;—কুন্তলা ঠাকুরের জন্য যাহা দিয়া আসে, তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করেন।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। কুন্তলা একদিন উকীল বাড়ী গিয়া একখানি দানপত্র প্রস্তুত করিল। তাহার যাহা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা এই দানপত্রের দ্বারা গোপীনাথকে অর্পণ করিল। দলিল-খানি গোপীনাথের মন্দিরে রাখিয়া দিয়া কুন্তলা গ্রামত্যাগ করিল। কোথায় গেল, কেহ জানিল না।

(৭)

কুন্তলা গৃহ ছাড়িয়া কপর্দ্দকমাত্র সঙ্গে না লইয়া একবস্ত্রে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিল। পথ জানে না,—পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ চলে। পয়সা নাই,—ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করে। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল.—কুন্তলা অদম্য উৎসাহে পথ হাঁটিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। এখনও বৃন্দাবন অনেক দূর। কুন্তলা আর তেমন পথ হাঁটিতে পারে না,—অনশনে, অর্দ্ধাশনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। উৎসাহ ক্রমে নিবিয়া আসিতেছে, শক্তি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কুন্তলা ভাবিল,—"ভগবান্, আমার উপায় কি হবে?"

একদিন সন্ধ্যাকালে কুন্তলা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পথের ধারে বৃক্ষাশ্রয়ে শয়ন করিল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই,—কেহ ভিক্ষা দেয় নাই। শ্রান্ত, অনশন-ক্লিষ্ট দেহ আর টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। কুন্তলা কণ্টকাকীর্ণ কঠিন মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল।

শুইয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার কপালে বুঝি বৃন্দাবন-দর্শন নাই। যে সেখানে যাইতে পায় তার পাপ আর থাকে না। আমি কাঁদিতে পারিলাম না—আমার পাপ

ধু'য়ে গেল না। বৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে চলিয়াছি, তা'ও বুঝি আমার ভাগ্যে ঘটিল না। ঠাকুর, আমার কি হ'বে? এ পাপ-ভার যে বহিতে পারি না।"

ভাবিতে ভাবিতে কুন্তলা ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নঘোরে মধ্যাকাশে সে এক সুন্দর মূর্ত্তি দেখিল। দেখিল, যেখানে নক্ষত্র ফুটে, চাঁদ জ্বলে—সেইখানে নবজলধরশ্যাম বংশীবাদন পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অধরে হাসি—নয়নে করুণা। শতচন্দ্র চরণনখরে প্রতিভাত হইতেছিল—সহস্র নক্ষত্র পদতলে গড়াগড়ি যাইতেছিল। আকাশ, পৃথিবী সব নিবিয়া গিয়াছে—ব্রহ্মাণ্ডের আলোকরাশি কেন্দ্রীভূত হইয়া মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। কুন্তলা ঘুমঘোরে কণ্টকিতদেহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি শ্রীহরি?"

উত্তর হইল—"হাঁ।"

"তুমি কি আমায় দর্শন দিতে আসিয়াছ, ঠাকুর?"

"না।"

"আমি যে তোমাকে দেখিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছি।"

"আমি বৃন্দাবনে থাকি না।"

"তবে কোথায় থাক?"

"আমি লোকের হৃদয়ে থাকি ; যে আমাকে ডাকিতে পারে—দেখিতে জানে, সেই আমার দেখা পায়।"

"আমি যে ডাকিতে জানি না, আমাকে ডাকিতে শিখাইয়া দেও, দয়াময় !"

কোন উত্তর আসিল না। কুন্তলা আবেগভরে পুনরায় বলিল, "তোমাকে ডাকিতে শিখাইয়া দেও, ঠাকুর !"

এবারও কোন উত্তর আসিল না। দেখিতে দেখিতে আকাশের সে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ম্লান হইয়া আকাশপটে মিশিয়া যাইতে লাগিল। কুন্তলা আকুল হৃদয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ব'লে দেও ঠাকুর, কি করিলে তোমাকে পাইব।"

দিগ্ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া চীৎকার উঠিল—'ব'লে দেও ঠাকুর, কি করিলে তোমাকে পাইব।' সেই সকাতর চীৎকারে স্থাবর জঙ্গম, আকাশ পৃথিবী কণ্টকিত হইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল—"ব'লে দেও ঠাকুর, কি করিলে তোমাকে পাইব।'

চীৎকার শব্দে কুন্তলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পৃথিবী দেখিল—আকাশ দেখিল—নক্ষত্র দেখিল ; কিন্তু

কোথাও সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। নিরাশা-নিপীড়িত অন্তঃকরণে আকাশপানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

স্বপ্নে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা কুন্তলার বেশ স্মরণ ছিল। কুন্তলা একে একে সেই কথাগুলি মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। নিশা যখন প্রভাত-প্রায়, তখন কুন্তলা গাত্রোত্থান করিয়া বৃক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিল; এবং যে পথে শান্তিপুর হইতে আসিয়াছিল, সেই পথে শান্তিপুর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

---

(৮)

কুন্তলার ভুল ভাঙ্গিয়াছে; সে আর বৃন্দাবন-গমনাভিলাষিণী নয়। কুন্তলা এখন বুঝিয়াছে, হৃদয়ের অবস্থা বিশেষের নাম বৃন্দাবন—স্থানের নাম নয়। যখন হৃদয়াভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজ করে, তখন মানুষের শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন ঘটে; নতুবা পাপাকুল হৃদয়ে চিরজীবন বৃন্দাবনধামে অতিবাহিত করিলেও মানুষ শ্রীবৃন্দাবন দর্শন পায় না।

পথে যাইতে যাইতে কুন্তলা ভাবিতে লাগিল, "ছি ছি

আমি করিয়াছি কি! অজ্ঞান, অবোধ মনের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কোথায় ছুটিয়া আসিলাম! গোপীনাথ, গোপীনাথ, অজ্ঞান তনয়াকে ক্ষমা কর। তোমার চরণ আমার বৃন্দাবন—তোমার চরণ আমার পুণ্যতীর্থ। তোমার চরণে জল ঢালিয়া আমি পাপের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছি—লোষ্ট্র ছাড়িয়া সোণা চিনিয়াছি। তুমি আমার বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—তুমি আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীহরি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর, ঠাকুর!"

গোপীনাথকে কাতর হৃদয়ে ডাকিতে ডাকিতে কুন্তলা পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস গড়াইয়া চলিল। কুন্তলা তেমন পথ চলিতে পারে না,—এক দিনের পথ দশ দিনে যায়। অনশন-ক্লিষ্ট, শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ টানিয়া কোন প্রকারে অবশেষে শান্তিপুরে পৌঁছিল।

সে দিন মহাবিষুব সংক্রান্তি। কুন্তলা তা' জানে না। পথে ঘাটে চারিদিকে লোক। সকলেই গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। কুন্তলা কৌতূহল পরবশ হইয়া একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা, তোমরা সকলে কোথায় চলেছ?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, "আ মর্ মাগি, জানিস্ নে, আজ যে চড়ক সংক্রান্তি।"

কুন্তলাও গঙ্গাস্নানে চলিল।

আকণ্ঠ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া কুন্তলা ভাবিল, "আজ আবার সেই মহা পুণ্যদিন। এই দিনে আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—আজ ব্রত উদ্যাপন করিব। মা সুরধুনি গঙ্গে, আমার পাপরাশি ধুয়ে দেও মা—দেহভার হ'তে আমাকে মুক্ত করে দেও মা। মা—মা—"

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দুইগণ্ড বহিয়া অজস্র-ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। দুই আঁখির দুই প্রবাহ, জাহ্নবী প্রবাহে দেহ মিশাইয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিল। এই ত্রিবেণী সংস্পর্শে—এই কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান তিনের সম্মিলনে জীবের মুক্তি ; বেশ্যার মুক্তি নাই কি ?

কুন্তলা স্নানান্তে গোপীনাথের মন্দির অভিমুখে চলিল। কুন্তলার দেহে—কি জানি কেন—এখন নবশক্তি, মনে নব উৎসাহ। কুন্তলা এই দীর্ঘপথ স্বল্পকাল মধ্যে অতি-ক্রম করিয়া অচিরে মন্দির-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইল।

তখন পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কুন্তলা সঙ্কোচ-শূন্য হৃদয়ে দালানে উঠিয়া পূজা দেখিতে লাগিল। সেবাইত মহাশয় স্বয়ং পূজা করিতেছিলেন। পূজান্তে তিনি ফিরিয়া

দেখিলেন—পশ্চাতে কুন্তলা। তাহাকে তিনি দর্শন-মাত্রেই চিনিলেন; বলিলেন, "এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছ? ঠাকুরকে প্রণাম কর মা!"

কুন্তলা, ঠাকুরের চরণ হইতে নয়ন না ফিরাইয়া বলিল, "কাহাকে প্রণাম করিব?—ঠাকুরকে?—আমি যে নিয়ত তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি—নিয়ত তাঁহার চরণে গড়াগড়ি দিতেছি। আমি যে তাঁহারই চরণের উপর মাথা রাখিয়াছি; আবার কোথায় মাথা রাখিয়া কাহাকে প্রণাম করিব?"

সেবাইত বিস্মিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাদোদক খাইবে?"

কুন্তলা। পাদোদক? পাদোদক কোথায় দিবে? আমাতে যে স্থান নাই,—সমস্ত দেহ গোপীনাথ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। মাথায় গোপীনাথ—জিহ্বায় গোপী-নাথ,—কোথায় পাদোদক দিবে?

সেবাইত আরও বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের প্রসাদী ফুল লইবে?"

কুন্তলা। ফুল? দেও—তাঁহার চরণের ফুল তাঁহার চরণের উপর দেও।

বলিয়া কুন্তলা পা বাড়াইয়া দিল। সেবাইত জ্ঞানী,

তথাপি তিনি কুন্তলার পায়ের উপর ফুল দিতে সাহস করিলেন না। কুন্তলা কোন দিকে আর ফিরিয়া দেখিল না,—নিমীলিত নয়নে ধ্যানে বসিল। সে ধ্যান আর ভাঙ্গিল না—কুন্তলা আর চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিল না।

সন্ধ্যাকালে সেবাইত মহাশয় কুন্তলার মৃতদেহ স্বয়ং বহিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটে দাহ করিলেন।

প্রতিশোধ।

———০ঃ০———

(১)

ছোট বউ, বড় বউকে বলিল,—"হাঁ দিদি, তোমার বাপের বাড়ী থেকে নাকি তত্ত্ব এসেছে ?"

বড় বউ বলিল,—"আস্‌বে না ত কি ? তাই ব'লে কি সকলের বাপের বাড়ী থেকে আস্‌বে ?"

এ আক্রমণটা ছোট বউয়ের উপর। তা'র বাপ বড় গরীব, কোন রকমে সংসার চালায়। সে বড় একটা তত্ত্ব করিয়া উঠিতে পারে না। বড় বউয়ের বাপ ধনী, নিয়তই তত্ত্ব পাঠায়। সুতরাং বড় বউ গর্ব্বস্ফীতা—ছোট বউ কুণ্ঠিতা—সঙ্কুচিতা

প্রত্যুত্তরে ছোটবউ বলিল,—"আমার বাপ গরীব,

তত্ত্ব দিতে কোথায় পাবেন? তোমার বাপের অবস্থার মত অবস্থা হ'লে তিনিও কত তত্ত্ব কর্‌তেন।"

বড় বউ বলিল,—"কত পুণ্যি কর্‌লে তবে আমার বাপের মত অবস্থা হয়। তাই ব'লে কি যে সে লোকের হ'বে?"

ছোটবউ মনে একটু কষ্ট পাইল। কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কি জিনিস এসেছে, দিদি?"

বড়বউ গর্ব্বভরে বলিল,—"দেখ্‌বি? আয়।"

ছোট বউ, বড় বউয়ের অনুসরণ করিল।

---

(২)

ছোট সংসার, কেবল দুটী ভাই। বাপ মা নাই। দুই জনের দু'টি স্ত্রী আছে। তা' ছাড়া সংসারে আর কেহ নাই। বাপ মায়ের জীবদ্দশায় উভয়ের উদ্বহন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। বড়বউ রূপে বায়সী, তবে ধনীর কন্যা; তাই একটু ঝাঁজ বেশী। দেখিয়া শুনিয়া বাপ মা, গরীবের মেয়ে আনিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠের নাম রামলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল।

নিবাস কল্যাণপুরে। পিতা বড় একটা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভদ্রাসনটুকু ও কিছু জমিজায়গা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তা' তা'তে মোটা ভাত কাপড় বেশ এক রকম চলিয়া যায়।

বিনোদের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তা'র বিবাহ হয়। আঠার বৎসর বয়সে সে মা বাপ হারাইয়া বড় ভাইকে আশ্রয় করে। এখন তা'র বয়স কুড়ি বৎসর। রামলাল তা'র চেয়ে ছয় বৎসরের বড়। বড় বলিয়াই বিষয়াদি যা' কিছু আছে তা'র তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিয়াছে। বিনোদ তাস খেলিয়া, গান গাহিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সে বিষয় কর্ম্ম বুঝে না—সংসারের ধার দিয়া যায় না।

লেখা পড়া বড় একটা কাহারও হয় নাই। কয়েক বৎসর বিদ্যালয়ে বৃথা ঘুরিয়া অবশেষে উভয়ে বিদ্যালয় গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিল। শুনিতে পাই, তাদের কোন দোষ ছিল না—দোষটা পণ্ডিতের; তাঁ'র লট লিটের দৌরাত্ম্যে কোন সুবোধ বালক বিদ্যালয়ে টিকিতে পারিত না।

ছোট বউ সুন্দরী। সুন্দরী হইলেও তাহাকে আমাদের পছন্দ হয় না। সে কেমন ঘ্যান-ঘেনে প্যান-পেনে।

তা'র তেজ আদৌ নাই। লোকে ভর্ৎসনা করিলে, কথার উত্তর দেয় না—বরং হাসে। বড় বউ মিথ্যা করিয়া তা'র ঘাড়ে কোন দোষ চাপাইলে, সে নীরব থাকিত,—ম্লানমুখে লোকের তিরস্কার খাইত। কেহ গালি দিলে গালি না পাল্টাইয়া নীরবে, নিভৃতে কাঁদিত: কেহ একটু আদর করিলে বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করিত। বড় বউ যদি কখন তার চুল বাঁধিয়া দিত, তা' হ'লে ছোট বউ কৃতার্থ হইত। স্বামীর জন্য দু'টা পান লুকাইয়া আনিতে পারিলে সে দিগ্বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করিত। এমন মেয়ে কি ভাল লাগে গা?

দেখ দেখি বড় বউ কেমন! দিনরাত্রি কেমন ফিট্ ফাট হয়ে বেড়াচ্ছে। হ'লই বা সে কাল, কুৎসিত; তার বাপের ত টাকা আছে। সে গায়ে গহনা পরে,' সাবানে গা ধু'য়ে, সিমলার কাপড়ে কালরূপ ঢেকে, কেমন ভাবযুক্ত হ'য়ে দিন রাত গজ্‌রে গজ্‌রে বেড়াচ্ছে। আর তেজই বা কি! স্বামীর সঙ্গে একটু মতভেদ হইলে সে বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া ছোটলোক স্বামীকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দেয়। স্বামী ত' দূরের কথা, পাড়ার বিড়াল কুকুরও বড় বউয়ের ভয়ে ত্রস্ত, ভীত। এমন না হ'লে আর বউ!

ভায়ে ভায়ে এখন বড় একটা মিল নাই। বিনোদের একপয়সার দরকার হইলে দাদার কাছে হাত পাতিতে হয়। চাহিলে কখন মিলে—কখন মিলে না! একটা জামা বা এক জোড়া বিনামা ১৩১০ সালের বৈশাখে মাগিলে ১৩১২ সালের চৈত্র নাগাদ মিলিতে পারে। তা' ছাড়া আবার ঝঙ্কার আছে। তবে সেটা অন্দর বিভাগ হইতেই বেশী আসে। দাদার অন্যায় তিরস্কার, ভর্ৎসনা বিনোদ অম্লানবদনে সহ্য করে; কিন্তু বউ দিদির তীব্রোক্তিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। বউদিদি নিয়ত বুঝাইতে চেষ্টা পায় যে, তার মত বড়লোকের মেয়ে এই ছোটলোক-দের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাহাদের উর্দ্ধতন বাহান্ন পুরুষ উদ্ধার করিয়াছে। বউ দিদির বাক্যবাণ, কঠোরোক্তি, সকলই বিনোদ নীরবে সহ্য করে। কিন্তু যখন সেই অপাপ-বিদ্ধা, সুকুমারমতি ছোট বউয়ের উপর হিমাদ্রি-বিদীর্ণকারী বাক্য-শেল নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে ধৈর্য্য হারাইয়া ক্ষিপ্তবৎ হয়। বিনোদের তখনকার অবস্থা দেখিয়া, স্বামী কাছে না থাকিলে সেই প্রচণ্ডা রাক্ষসীও ভয় পায়। কিন্তু ছোট বউ ইহাতে মরমে মরিয়া যায়। ঘটনার পর স্বামী প্রকৃতিস্থ হইলে, তাহাকে নিভৃতে বলে, "কেন তুমি দিদিকে অমন ক'রে বল? ছি, আমি লজ্জায়

মরে যাই। তিনি দিদি, গুরুজন—আমরা দোষ কর্‌লে তিনি বক্‌বেন না ত রাস্তার লোক বক্‌তে আসবে?" ইত্যাদি।

---

(৩)

বড় বউয়ের পাছু পাছু ছোট বউ তত্ত্ব দেখিতে চলিল। দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে সৌখীন দ্রব্যের ঘটাটা কিছু বেশী। ফিতা, চিরুণী, গন্ধদ্রব্য, সাবান, পুতুল, খেলানা, সেমিজ, জ্যাকেট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যে হর্ম্ম্যতল সুশোভিত। সকল জিনিষ দেখিয়া ছোট বউ বলিল, "দিদি, আমাকে একটা জিনিষ দিবে?"

বড় বউ। কি চাও?

ছোট বউ। এক শিশি আতর।

বড় বউ। ও সব সৌখীন গন্ধদ্রব্য নিয়ে তুমি কি কর্‌বে! যার পর্‌তে কাপড় জুটে না তা'র আবার আতর মাখা কেন?

ছোট বউ আর কিছু বলিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেখানে এক দাসী দাঁড়াইয়াছিল, তার নাম পাঁচি। সে বড় বউয়ের দাসী হইলেও ছোট বউকে

বেশী ভালবাসিত। ছোট বউয়ের বিমর্ষ মুখখানি দেখিয়া তা'র প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। সেখানে আর সে দাঁড়াইল না,—স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু ছোট বউয়ের মুখখানি তার প্রাণে গাঁথা রহিল।

দুইদিন পরে বাড়ীতে এক মস্ত গোল বাধিল; বড়-বউয়ের আতরের শিশি চুরি গিয়াছে। চোর ধরা বড় কঠিন হইল না—গন্ধেই ধরা পড়িল, সে গন্ধ চাপিয়া রাখা বড় সহজ নয়। ছোট বউ যে দিকে যায়, সেই দিকেই বোঁটা-ভাঙ্গা ফুলের গন্ধ। বড় বউ গর্জ্জিয়া ছোট বউকে ধরিল। ছোট বউ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কেন দিদি, তুমিইত আমায় আতর মাখিতে দিয়াছ।"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল—বারিধিহৃদয়ে প্রভঞ্জন নাচিয়া উঠিল। বড়বউ চীৎকার করিয়া বলিল,—"আমি তোকে দিয়েছি! চোর! ছোটলোক! মিথ্যাবাদী!"

ছোটবউ স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল, কিছু বলিতে সাহস পাইল না। সে চুপ করিলেও বড়বউ চুপ করিতে পারে না। আগ্নেয় গিরির বিদীর্ণবদন-নিঃসৃত জ্বলন্ত অনলরাশির ন্যায় তাহার মুখগহ্বর হইতে জ্বালাময়ী বাক্যাবলী বিনির্গত হইতে লাগিল। সে বাক্যানলে মানুষ পুড়িয়া ছাই হয়, কিন্তু

ছোট বউয়ের ধৈর্য্য পুড়িল না। সে নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি, শিশিটা এনে দিব? আমি ফোঁটাকতক নিয়েছি বইত নয়।"

এবার বৈশাখী মেঘে বিজলী খেলিল—হুঙ্কার রবে ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। বড়বউ গর্জ্জিয়া বলিল,—"এত বড় আস্পর্দ্ধা! তোর প্রসাদী জিনিষ আমায় দিতে আসিস্!"

তখন ছোটবউকে ছাড়িয়া ছোট বউয়ের পিতৃমাতৃকুল এমন কি শ্বশুরকুলের উপরেও ঝড়ের বেগটা পড়িল। ভাষায় যতদূর গালি দেওয়া সম্ভব ততদূর গালি চলিল। ছোটবউয়ের যে যেখানে আছে—কেহই অব্যাহতি পাইল না। প্রাণ ভরিয়া সকলকে গালি দিয়া বড়বউ অবশেষে ছোটবউকে বৈধব্য-অভিসম্পাত দিল। তখন ছোটবউয়ের মৈনাকতুল্য অটল ধৈর্য্যও ঝটিকা তাড়নায় নড়িয়া উঠিল। সে বলিল,—"দিদি, আমি দোষ ক'রে থাকি আমায় গালি দেও, শাস্তি দেও, যারা নিরপরাধ তাদের কেন গালি দিতেছ?"

এবার উনপঞ্চাশৎ পবন নীল কাদম্বিনীর পাছু তাড়না করিয়া ছুটিল; বড়বউ মুখ ছাড়িয়া হাত ধরিল; উন্মত্ত নর্ত্তনে হর্ম্ম্যতল প্রকম্পিত করিয়া বড়-

বউ কমলতুল্য কোমল ছোটবউয়ের অঙ্গে পদাঘাত করিল।

এমন সময় তথায় বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ যখন সকল কথা শুনিল, তখন সে দ্বাদশ রবির তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সে অনলে কোন গ্রহ ভস্মীভূত হইল কিনা জানি না, কিন্তু গৃহের সুখ, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সকলই পুড়িয়া গেল। ক্রোধানলে দেবত্ব আহুতি দিয়া বিনোদ পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইল।

গোলমাল শুনিয়া রামও ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ভায়ে ভায়ে বচসা আরম্ভ হইল। বচসায় কখন ঝগড়া মিটে না—বরং বাড়ে। এ ক্ষেত্রেও ঝগড়া পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল। রামলাল চীৎকার করিয়া বলিল, "তুই আমার বাড়ী হ'তে দূর হ'।" বিনোদও সমান উত্তর করিয়া জানাইল যে, পৈতৃক ভিটায় তাহারও স্বত্ব আছে। ঝগড়া কতদূর গড়াইত বলা যায় না; কিন্তু ইচ্ছামত স্রোতমুখে যাইতে পারিল না। কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা প্রতিবেশী অযাচিতরূপে আসিয়া মধ্যস্থ হইল। তাহারা বিনোদকে সস্ত্রীক কিছু দিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী গিয়া

বাস করিতে উপদেশ দিল। তাহারা বুঝাইয়া বলিল, কিছুদিন বাদে পৈতৃক বিষয় ভাগ করিয়া লইলেই চলিবে।

তাহাদের পরামর্শমত বিনোদও তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর হাত ধরিয়া শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার সময় দাদাকে শাসাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "যদি বেঁচে থাকি, এ ব্যবহারের প্রতিশোধ এক দিন দিব।"

ছোটবউ পিত্রালয়ে যাইতেছে দেখিয়া, পাঁচি কোথা হইতে আসিয়া বলিল,—"দাঁড়াও ছোট বউদিদি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি মাইনে চাই না—কেবল দু'টো খেতে চাই। তাও যদি না দাও, তবুও তোমার কাছে থাক্‌ব, যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, ততদিন তোমার সেবা করুব। একটু দাঁড়াও, বড়বউকে দু'টো কথা বলে নি। দেখ বড়বউ, তোমার মত ছোট লোকের কাছে আমি আর চাক্‌রি কর্‌তে চাইনে। দেখ, আমার কাছে মুখ ধোরো না—তুমি চোদ্দ পুরুষ তুল্‌লে, আমি ছাপ্পান্ন পুরুষ তুল্‌ব। একটা কথা তোমায় বল্‌বার জন্য দাঁড়ালুম। যে শিশিটার জন্য তুমি ছোট বউদিদিকে লাথি মার্‌লে, তাড়িয়ে দিলে,

সে শিশিটা আমি চুরি ক'রে ছোট বউদিদিকে দিয়েছিলাম। দিয়ে ব'লেছিলাম, শিশিটা তুমি তা'কে দিয়েছ। চুরি করা জিনিস জান্‌তে পার্‌লে ছোট বউদিদি লাথি মেরে শিশিটা ফেলে দিত। তুমি এত পমান করেছ, তবু সে মুখফুটে আমার নাম করেনি। কি বল্‌ব এতদিন তোমার নুন খেয়েছি, নইলে যে লাথি মেরেছ, তা'র প্রতিশোধ দিতাম।"

বাধা দিয়া বিনোদ বলিল,—"একদিন এ অপমানের প্রতিশোধ আমি দিব। যে পায়ে তুমি লাথি মেরেছ, যে মুখে দাদা গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই—"

ছোটবউ মুখ চাপিয়া ধরিল—কিছু বলিতে দিল না।

---

(৪)

শ্বশুরালয় দ্বারভাঙ্গায়। যাইতে দুইদিন লাগিল। শ্বশুর বড় গরীব, রাজষ্টেটে সামান্য চাকুরি করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। তিনি জামাইয়ের গ্রাসাচ্ছাদন ভার লইতে অক্ষম হইলেও দায়ে পড়িয়া লইতে হইল। কিছুদিন বাদে শ্বশুর বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু, এ বয়সে ব'সে থাক্‌লে ত চল্‌বে না, কিছু কাজকর্ম্ম করা

উচিত। আমি বুড়ো হয়েছি, কেমন করে একা এত বড় সংসার চালাই বল।”

বিনোদ কথা কহিল না। আবার কিছুদিন গত হইল। শ্বশুর একদিন বলিলেন, “না হয় ভাইয়ের সঙ্গে বিষয় ভাগ করে নিয়ে পৈতৃক ভিটায় থাকগে; আমি আর ক'দিন পারি বল।” বিনোদ বলিল, “ভাইয়ের সঙ্গে বিষয় ভাগ কর্‌ব না! হাজার হ'ক তিনি আমার বড় ভাই।” শ্বশুর তখন সরোষে বলিলেন, “না ভাগ করে নেও, অন্য কোন উপায় দেখ—নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে আমার ঘাড়ে চেপে থাক্‌লে চিরকাল চল্‌বে না।”

লজ্জায় ঘৃণায় বিনোদের মুখ লাল হইল। সে উঠিয়া গৃহমধ্যে গেল। সেখানে শ্যালিকা একটু গঞ্জনা দিল। তখন বিনোদের অভিমানপূর্ণ হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া চলিল।

---

(৫)

প্রাণের ধিক্কারে গৃহত্যাগ করিয়া বিনোদলাল, জয়-পুরে এক উকীলের গৃহে আশ্রয় লইল; এবং পিতামাতার

সহস্র অনুরোধে যাহা কখন করে নাই, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে লাগিল ;—স্থানীয় পুস্তকাগারে যত পুস্তক ছিল একে একে পড়িয়া শেষ করিল। জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান একে একে অনন্য-সাহায্যে পড়িল। তাহার অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্রয়দাতা উকীল বাবু বিস্মিত হইলেন। বিনোদের আলস্য নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই—সে দিবারাত্রি অনন্য-কর্ম্ম হইয়া পাঠে নিযুক্ত। পুরুষকারের পদপ্রান্তে সিদ্ধি লুণ্ঠিত,—চারি বৎসর পরে বিনোদ মনের শান্তি ফিরাইয়া পাইয়া পাঠাগার পরিত্যাগ করিল।

উকীল বাবু রাজসরকারে বিনোদের একটু চাকরি করিয়া দিলেন। বেতন দশ টাকা মাত্র; কিন্তু বিনোদ তাহাতেই সন্তুষ্ট। অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সে সততা ও অধ্যবসায় গুণে ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে লাগিল। সিদ্ধি আকৃষ্ট হইয়া সাধনার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিল ;—বিনোদ দশ বৎসর পরে রাজসরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইল।

তখন বিনোদ পরিবার আনিল। পরিবারের পাছু পাছু অনেকেই আসিল। শ্যালক, শ্যালিকা, শ্যালকপুত্র সকলেই আত্মীয়তা করিতে বিনোদের কাছে ছুটিয়া

আসিল। বিনোদ রাজসরকার হইতে বাস করিবার জন্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পাইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবে পরিপূর্ণ হইল। সংসারে যে তাহার এত আত্মীয়, বান্ধব ছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এক্ষণে সম্পদের দিনে জগৎ বন্ধুময় হইয়া উঠিল।

সকলে আসিল বটে, কিন্তু কল্যাণপুরের কেহ আসিল না। সে দূরবর্ত্তী গ্রামে বিনোদের সম্পদের কথা পৌঁছায় নাই; বিনোদও কোন সংবাদ লয় নাই, বা পাঠায় নাই। কার কাছেই বা বিনোদ সংবাদ পাঠাইবে? সে গ্রাম হইতে বিনোদের দাদার বাস উঠিয়াছে। কেমন করিয়া উঠিল, তা' বলিতেছি।

রামলাল নিজে লোকটা মন্দ নহে; তবে স্ত্রীর সম্পূর্ণ শাসনাধীন। স্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রামলাল ও বিষয়াদি উভয়ই চলিত। বড় মানুষের মন যোগাইতে যোগাইতে রামলাল ও বিষয় হায়রাণ হইয়া পড়িল,—রামলাল ঋণগ্রস্ত হইল, বিষয় বন্ধক পড়িল। বাঁধাবাঁধি না থাকিলে ঋণ কমে না, বরং বাড়ে। দেনা যখন দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তখন এক বিপদ আসিয়া বড় বউয়ের হৃদয়ে বজ্রাঘাত-তুল্য আঘাত করিল। বড় বউয়ের পিতার

একখানি বড় দোকান ছিল। পিতা হঠাৎ দেউলে হওয়ায় সে দোকানখানি উঠিয়া গেল। সেই সঙ্গে মহাজন পাওনাদার সকলে মিলিয়া তাহার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিয়া শৃগালের ন্যায় লুটিয়া লইল। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও সকল ঋণ পরিশোধ হইল না। তাহাকে জেলে দিবে বলিয়া পাওনাদারেরা শাসাইতে লাগিল। পিতার সে বিপদে বড় বউ স্থির থাকিতে পারিল না ;—নিজের অলঙ্কার, স্বামীর ভদ্রাসন প্রভৃতি বেচিয়া পিতার সাহায্যে অগ্রসর হইল। কন্যার সাহায্যে পিতা জেল হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ঘোর দরিদ্রতায় পড়িয়া রিক্তহস্তে কন্যার গৃহে সপরিবারে আশ্রয় লইল। কন্যার তখন কিছুই নাই ; ভদ্রাসন, বিষয়-সম্পত্তি, অলঙ্কার সকলি গিয়াছে। পিতাকে দু'মুঠা খাইতে দিবারও তাহার সামর্থ্য নাই। দেখিয়া শুনিয়া রামলালও নিশ্চেষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় মহাজন আসিয়া বাড়ী দখল করিল। তখন পরামর্শ আঁটিয়া সকলে কল্যাণপুর ত্যাগ করিয়া চলিল।

---

(৬)

আজ দেওয়ান বিনোদলাল বিচারে বসিয়াছেন। কতকগুলা লোক অভিযুক্ত হইয়া দেওয়ানের সমক্ষে নীত হইয়াছে। অপরাধ গুরুতর। রাজসরকারের মোহর দস্তখত জাল করিয়া হরিপুর পরগণা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আজ তাহাদের বিচার—দেওয়ান বিচারক।

আসামীরা সংখ্যায় অনেক—প্রায় দশ বারজন হইবে। প্রধান অপরাধী—বড় বউয়ের পিতা ও স্বামী। বড়বউও অব্যাহতি পায় নাই—সেও একজন আসামী। তাহার ভাই, ভগিনী, মা প্রভৃতি সকলেই অভিযুক্ত হইয়া বিচারাসনের সম্মুখে নীত হইয়াছে। দেওয়ানের অট্টালিকার একতম অংশে বিচারগৃহ। সেই সুপ্রশস্ত বিচারালয় লোকে পরিপূর্ণ। আসামীদের চারিদিকে সিপাহী দল—বিচারাসনের চারিদিকে কর্ম্মচারিবৃন্দ। আশে পাশে নীরব দর্শকমণ্ডলী। সাক্ষ্য প্রমাণাদি সকলি গৃহীত হইয়াছে। তবে এখনও হুকুম হয় নাই। হুকুমের প্রতীক্ষায় সকলেই বিচারকের মুখ পানে চাহিয়া আছে। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বিচারক অবশেষে নিস্তব্ধ গৃহমধ্যে ধীরে

ধীরে বিচারফল পাঠ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আসামীগণ, তোমাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। তোমাদের গর্হিত কার্য্যে রাজসরকার বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেই জন্য আমি রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ তোমাদের দশ সহস্র চলিত মুদ্রায় দণ্ডিত করিতেছি। যতদিন না এই অর্থ দিতে পার, ততদিন কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে।"

তখন একজন জমাদার অগ্রসর হইয়া আসামীদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ লোগ্ রূপেয়া দেগা?"

রামলাল উত্তর করিল, "না, দিবার ক্ষমতা নাই। আজও নাই, বিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও জন্মিবে না।"

জমাদার বলিল, "তব্, জেলখানামে চলো।"

আসামীদের মধ্যে যাহারা স্ত্রীলোক, তাহারা আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না,—হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল। পুরুষেরা সান্ত্বনা দিবে কি, নিজেরাই অশান্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় দেওয়ান বিচারাসন হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "জমাদার, একটু অপেক্ষা কর।"

অর্দ্ধ দণ্ড পরে দেওয়ান একটা ছোট পুঁটলি হস্তে

ফিরিয়া আসিয়া, দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই গহনা গুলি আবদ্ধ রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা আমায় কর্জ্জ দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। এই গহনার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা না হইতে পারে, কিন্তু আমার গৃহে আর এক টুক্‌রাও সোণা রূপা নাই।"

একজন সম্ভ্রান্ত মহাজন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা তখনি আনিয়া দিল; কিন্তু গহনা লইল না; বলিল, "আপনার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আপনাকে আমি যথাসর্ব্বস্ব কর্জ্জ দিতে পারি।"

তখন বিনোদলাল, রামলালের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "আমি এতদিন যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা আপনার চরণে অর্পণ করিতেছি। অর্থদণ্ড দিয়া কারামুক্ত হউন।"

রামলাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, "টাকা! অর্থদণ্ড! আপনি কে?"

বিনোদ বলিলেন, "দাদা, আমি বিনোদ।"

রামলাল বলিল, "বিনোদ! যা'কে আমি অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি সেই বিনোদ! সেই আমাকে টাকা দিয়া রক্ষা করিতেছে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

বিনোদ কোন উত্তর না দিয়া নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রামলাল, বিনোদের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, এই কি তোমার প্রতিশোধ?"

বড় বউ সুদূর গবাক্ষপানে নেত্রপাত করিয়া দেখিল, ছোট বউ দণ্ডায়মান। তাহার নয়নে জল, অধরে হাসি, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ।

ঋণ-মুক্তি।

—*—

(১)

"কেন বালিকা, তুমি রাত্রিদিন কাঁদ? তোমার স্বামীর খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছি—বিলাতেও পত্র লিখেছি।"

"সাহেব, তোমার দয়ার শরীর, তুমি অভাগিনীর জন্য যথেষ্ট কষ্ট করিতেছ, কিন্তু—কিন্তু—"

"আবার কাঁদিতেছ? ছি!"

"না কাঁদিয়া থাকি কেমন করে, সাহেব?"

"তোমার সেই স্বামীর স্বামী জগৎস্বামীকে ডাক, তা'হলে প্রাণে শান্তি পাবে।"

শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় জলভারাকুল নয়ন দুইটি

একবার সাহেবের মুখ পানে তুলিয়া বালিকা বলিল, "সাহেব, আমরা হিন্দুর মেয়ে, স্বামীকে ঈশ্বরের উপর স্থান দিয়া থাকি। যদি সেই স্বামীকে না পাইলাম তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি?"

সাহেব। হিন্দু মেয়ের প্রাণ কি ধাতুতে গঠিত তা' আমরা জানি না; আমরা জানি, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ দুই দিনের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরদিনের। তার সঙ্গে মানুষের তুলনা!

বালিকা। সাহেব, তুমি স্ত্রীলোক নও তাই এ কথা বলিতেছ। তুমি যদি স্ত্রীলোক হ'য়ে হিন্দুর ঘরে জন্মাতে, তা'হলে আমার মনোভাব বুঝিতে পারিতে। একবার আমাদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়; আমি দেখিলাম, আমার স্বামী দণ্ডবৎ হইয়া প্রতিমা-পদতলে প্রণাম করিতেছেন। আমি কিন্তু সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমাকে প্রণাম না করিয়া আমার জীবন্ত দেবতা স্বামীর চরণে প্রণাম করিলাম।

সাহেব। তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা ভাল জান, আমরা কিন্তু কাহারও জন্য চিরদিন কাঁদিয়া নিজের জীবন —আত্মীয় স্বজনের জীবন অশান্তিময় করি না।

বলিয়া সাহেব ক্ষুণ্ণমনে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

(২)

বালিকার নাম পুষ্প—বয়স পনর বৎসর; শ্বশুরালয় বেদগ্রামে। স্বামী সনাতন মিত্র, কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন। বালিকা শ্বশুরকে দেখে নাই—শুধু শ্বাশুড়ীকে পাইয়াছিল। কিছু জমিজমা ছিল, তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলিত। সংসার সুখের না হইলেও বড় একটা দুঃখের ছিল না। এমন সময় সহসা একদিন বজ্রনির্ঘোষ তুল্য সংবাদ আসিল, সনাতন দেশ ছাড়িয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। কথাটা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। যে পরশ্রীকাতর, সে রাষ্ট্র করিল, সনাতন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। সঠিক সংবাদ কোথাও পাওয়া গেল না। গৃহিণী অবশেষে হতাশ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। সে শয্যা তাঁহাকে আর ত্যাগ করিতে হইল না, স্বল্পকাল মধ্যে চিতার উপর শুইয়া তিনি সকল চিন্তা—সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

পুষ্প মরিল না—তাহার পাষাণ হৃদয় কিছুতেই ভাঙ্গিল না। কিন্তু বড়ই বিপাকে পড়িল। শ্বশুরের ভিটায় আর কেহই নাই,—সে একা; একে কুলবধূ, তা'য়

বয়সে নবীনা। বিষয়াদি দেখে এমন লোক নাই। যাহাদের দেখিবার কথা, তাহারা রক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া পুষ্প শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে আসিল। সেখানে এক মাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বই আর কেহ নাই। গুণধর ভ্রাতা সুযোগ ছাড়িলেন না; তিনি স্বল্পকাল মধ্যে ভগ্নীর অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনাথিনী পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে অনেক বিপদ্; বিশেষ যার রূপ যৌবন আছে, তার বিপদের সীমা নাই। বালিকা দেখিল, সে যেখানে যায়, সেইখানেই উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র যুবকের দল তাহার পিছু লয়। কোন গৃহস্থ অভাগিনীকে আশ্রয় দিল না। আশ্রয়হীনা যুবতীকে আশ্রয় দিয়া কে সমাজে কলঙ্ক কিনিবে? এ বিষয়ে হিন্দুসমাজ বড় সতর্ক! আশ্রয় না পাইয়া পুষ্প আর জীবনভার বহন করিতে পারিল না,—ব্রহ্মপুত্রগর্ভে সে ভার নামাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

বালিকা ব্রহ্মপুত্র-তীরে আসিয়া দাড়াইল। নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত নীলাম্বু-হৃদয়ে আশ্রয় অন্বেষণে বালিকা আকণ্ঠ জলে নামিল; কিন্তু মরিতে পারিল না;—স্বামীকে মনে

পড়িল। তাহার মনে আশা জাগিল, একদিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবে। বালিকা নদীতট হইতে ফিরিয়া বনপথ অবলম্বন করিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে বালিকা সভয়ে দেখিল, কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। পুষ্প চীৎকার করিয়া উঠিল। দুর্ব্বৃত্তেরা ছাড়িল না,—বালিকাকে ধরিল। পুষ্প সাধ্যমত আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বালিকার বল কত-টুকু? শীঘ্রই সে অবসন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল।

তখন নিরুপায় হইয়া পুষ্প কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "কোথায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গে, অনাথাকে রক্ষা কর মা! শুনেছি তোমার নাম স্মরণে বিপদ থাকে না। বিপন্না আমি তোমাকে ডাকিতেছি মা, আমাকে রক্ষা কর—আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর।"

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে পুষ্প দেখিল, একজন সাহেব অশ্বারোহণে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল; এবং ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বেত্রহস্তে দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণ করিল। পাষণ্ডেরা প্রহৃত হইয়া যে, যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। সাহেব

অচেতনপ্রায় পুষ্পকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সাহেব—একজন চা-কর—নাম জর্জ্জ বার্ড।

---

(৩)

আজ দুই মাস হইল পুষ্প, সাহেবের আশ্রয়ে আসিয়াছে। সাহেব তাহাকে অন্যত্র পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন না—বালিকাও ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যত্র গেল না। সে আর কোথায় যাইবে? এ বিশ্ব সংসারে তাহার স্থান কোথায়? পুষ্প সাহেবের গৃহে আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল।

সাহেবের পুত্র কন্যা নাই; কিন্তু স্ত্রী আছে। ক্ষোভের বিষয়, মেম সাহেব কুরূপা। কুরূপা হইলেও স্বামি-প্রেমে বঞ্চিতা ছিলেন না, প্রেমময় হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা অযাচিতরূপে পাইয়াছিলেন। এত ভালবাসা পাইয়াও মেম সাহেবের মনে শান্তি ছিল না,—তিনি স্বামীর চরিত্রে অযথা সন্দিহান ছিলেন। সাহেব কিন্তু নিষ্কলঙ্ক—দেবচরিত্র।

পুষ্প সাহেবের গৃহে আশ্রয় লইল বটে, কিন্তু মোটা শাড়ী ছাড়িয়া গাউন পরিল না, শাঁখা খুলিয়া হাতে

ব্রেস্‌লেট উঠাইল না। সহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও বুট মোজা পরিল না—সাহেবের গৃহে অন্নজল গ্রহণ করিল না। উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল; পুষ্প তথায় আশ্রয় লইল। একা থাকিত না, একজন হিন্দু দাসী তাহার কাছে শুইয়া থাকিত। দাসী জল আনিয়া দিত, পুষ্প স্বহস্তে পাক করিত। আহারের কোন আড়ম্বর ছিল না। কিছু চাউল আর দুটা আলু বা কাঁচ-কলা হইলেই বালিকার চলিয়া যাইত। তবে একাদশীর দিন মাছ না খাইয়া ছাড়িত না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার স্বামী জীবিত আছেন—একদিন না একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে।

সাক্ষাতের আশা থাকিলেও বালিকা সময়ে সময়ে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না। সাহেব কত বুঝাইতেন, পুষ্প বুঝিত না; -সাহেবের পদতলে কার্পেটমণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে বসিয়া কাঁদিত। সাহেবও সেই সঙ্গে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। আবার অপরের অজ্ঞাতসারে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বালিকাকে কত সান্ত্বনা দিতেন।

একদিন সাহেব বিলাত হইতে একখানা পত্র পাইয়া সানন্দে পুষ্পকে বলিলেন,—"বেটি, আজ আমার জামাইয়ের খবর পেয়েছি।"

"কার খবর পেয়েছ বাবা?"

"আমার জামাইয়ের—তোর স্বামীর।"

পুষ্প আর দাঁড়াইতে পারিল না,—কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল; এবং ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি খবর—কি খবর পেয়েছ?"

বলিতে বলিতে পুষ্প চৈতন্য হারাইয়া ভূ-পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

---

(৪)

তা'র পর আরও কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। পুষ্প, বার্ড সাহেবের গৃহে তেমনই আছে। তবে এখন বড় একটা কাঁদে না। যদি কখনও কান্না আসে, গোপনে কাঁদে। হাসিমুখ ছাড়া বিষাদাচ্ছন্ন মুখ সাহেবকে দেখায় না। সাহেব মহাসুখী।

একদিন বার্ড সাহেব, পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ, (সাহেব পুষ্প বলিতে পারিতেন না) আমাদের দেশে যাবে?"

"না।"

"কেন ?"

"তা'হলে জাতি যাবে।"

"তবে তোমার স্বামীরও জাতি গিয়াছে।"

পুষ্প অন্যমনস্ক হইল—কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। সাহেব বলিলেন, "পুষ্, তোমার স্বামী বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া আসিতেছেন; তুমি তাঁহার উপযুক্ত স্ত্রী হইবার চেষ্টা কর।"

পুষ্প, কাতরনয়নে সাহেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল—কোন উত্তর করিল না। সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ্, তুমি লেখা পড়া জান ?"

"জানি—স্বামী শিখাইয়াছিলেন।"

"তবে একখানা পত্র লিখিয়া দাও, তোমার স্বামীর নিকট তাহা পাঠাইয়া দিব।"

পুষ্পের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সাহেব বলিলেন, "পত্রে আমার কথা লিখিও না।"

পুষ্প। তোমার কথা ছাড়িয়া দিলে লিখিবার আর যে বড় একটা কিছু থাকে না, বাবা।

সা। থাকে বই কি। লিখিও যে, এক্ষণে তুমি তোমার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছ, আর সেই সম্পত্তি হইতে—

পু। সম্পত্তি হইতে কি ?

সা। সম্পত্তি হইতে তুমি তাহাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছ।

পু। কথাটা আমি বুঝিলাম না।

সা। আর কি করিয়া বুঝাইব ?

পু। তুমি কি আমার স্বামীকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছ ?

সা। হাঁ—তোমার নাম দিয়া আমি পাঠাইতেছি। এবার বুঝেছ ?

পু। আমার স্বামী কি দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন ?

সা। এমন কিছু নয়; তবে কিছু টাকার প্রয়োজন হ'য়েছে। তা' তুমি কিছু ভেবো না।

বালিকা ছলছল্ নয়নে সাহেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল, একটিও কথা কহিতে পারিল না। সাহেব সেখানে আর দাঁড়াইলেন না—স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

---

(৫)

সাহেব একদা মেমসাহেব ও পুষ্পকে লইয়া নৌকা-বিহারে বহির্গত হইয়াছেন। সুন্দর তরণী—ফুলমালা

বিশোভিত। সুন্দর জল—নীল, স্বচ্ছ, বীচিবিক্ষেপী। সুন্দর আকাশ—নীলিমা মণ্ডিত—দিগন্তপ্রসারিত।

বজরার ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া পুষ্প শুইয়া আছে। কাম্‌রার ভিতর সাহেব ও মেম। পুষ্প আকাশ দেখিতেছে। আকাশ দেখিয়া বুঝি তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। তাই নীরবে, পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া আছে। অনন্ত আকাশে ছিদ্র নাই, দাগ নাই,—শুধু আকাশ—শুধু অনন্ত নীল। পদনিম্নে জল,—শুধু জল—মলা নাই, রেখা নাই—শুধু জল। পুষ্প কখন জল দেখিতেছে, কখন বা আকাশ দেখিতেছে। কোন্‌টা সুন্দর? জল না আকাশ? পুষ্প ভাবিল, বুঝি আকাশটাই সুন্দর।—আকাশ সীমাহীন, অনন্ত বিস্তৃত—বিকার নাই চাঞ্চল্য নাই, গর্জ্জন নাই—বুঝি অনন্ত-রূপাধারের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া আকাশ এত স্থির, এত সুন্দর।

দেখিতে দেখিতে আকাশ রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। উত্তর-পশ্চিমকোণে মেঘ সঞ্চিত হইয়া নীলাকাশের কিয়দংশ কৃষ্ণবর্ণে সমাচ্ছাদিত করিল। মেঘান্তরালে মারুত লুকাইয়া ছিল, এক্ষণে আলস্য ছাড়িয়া সোঁ সোঁ শব্দে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আকাশ পৃথিবী কম্পিত করিতে

লাগিল। ব্রহ্মপুত্রের নীল জল সহসা জাগিয়া উঠিয়া, ফেনরাশি মাথায় বাঁধিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ছুটিল। সমস্ত জীব জন্তু শঙ্কিত হৃদয়ে আশ্রয়াণ্বেষণে ছুটিল। মাঝি-মাল্লারা ভয় পাইয়া সাহেবকে বলিল, "হুজুর, ম্যাঘ উঠেছে।"

সাহেব বাহিরে আসিলেন এবং চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন; ভীত হইয়া পুষ্পকে বলিলেন, "পুষ্, ভিতরে এস।"

"কেন বাবা, আমি ত বেশ আছি।"

সাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা কিনারায় লাগাও।"

এমন সময়ে মেম সাহেব বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হ'য়েছে?"

উত্তর কেহ দিল না—দিবার প্রয়োজনও হইল না;—মেঘের আড়ম্বর দেখিয়াই মেম সাহেব বুঝিলেন, ব্রহ্মপুত্রের বিশাল তরঙ্গময় বক্ষ এখন তত নিরাপদ নয়। তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া বলিলেন, "নৌকা কিনারায় লাগাও—পুষ্, ভিতরে এস।"

পুষ্প উঠিল; সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিল। এমন সময় বায়ু সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বজরার

উপর আসিয়া পড়িল। নৌকা টলিল—পুষ্প পদস্খলিত হইয়া নদবক্ষে পড়িয়া গেল।

সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া অঙ্গ হইতে বস্ত্রাদি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতলব কি?"

কার্য্যে বিরত না হইয়া সাহেব উত্তর করিলেন, "পুষ্পকে রক্ষা করিব।"

মেম। নিজের জীবন বিপন্ন করে?

সাহেব কোন উত্তর না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মেম সাহেব চীৎকার করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমার কে, যে তাহার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছ?"

নদগর্ভ হইতে উত্তর আসিল, "সে আমার আশ্রিত।"

---

(৬)

পুষ্প মরে নাই—বাঁচিয়াছে। সাহেব আবার তাহাকে কুঠীতে আনিয়াছেন। পূর্ব্বে সাহেব তাহার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণরক্ষা করিলেন। পুষ্প, ভক্তি ও প্রীতিভাণ্ড শূন্য করিয়া সাহেবের চরণে ঢালিল।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। পুষ্প মধ্যে মধ্যে স্বামীর পত্র পাইত; সেও মধ্যে মধ্যে স্বামীকে পত্র লিখিত। পুষ্প একবার স্বামীকে লিখিয়াছিল, "বার্ড সাহেব কেমনতর জানিতে চাহিয়াছ; কিন্তু কেমন করিয়া সে সৌম্যমূর্ত্তি, সে উদার হৃদয় তোমার চক্ষের সামনে আঁকিয়া ধরিব? আমি কখন দেবতা দেখি নাই, সুতরাং বলিতে পারি না তিনি দেবতা কিনা। স্বর্গে যদি বার্ড সাহেবের মত তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকেন তা হ'লে স্বর্গ কত পবিত্র, কত পুণ্যময়!"

স্বামী সনাতন মিত্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, পুষ্প! যে দেশে বার্ড সাহেবের মত দেবতা থাকেন, সে দেশ পবিত্র, পুণ্যময়। তুমি জান কিনা জানি না, এই বার্ড সাহেব—এই দেবতার দেবতা আমাকে মাসে মাসে দুই শত টাকা দুই বৎসর ধরিয়া নিয়মমত পাঠাইতেছেন। যদি এই দেবতা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমাকে এতদিন অনাহারে মরিয়া যাইতে হইত, অথবা অনাবৃত দেহে এই ভীষণ তুষারপাতের মধ্যে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। পুষ্প, আমি দেখি নাই, বার্ড সাহেব কেমন, কিন্তু আমি দূর হইতে বুঝিতে

পারিতেছি, বার্ড সাহেব মহাপুরুষ। যদি মানুষের কোটি জন্ম থাকে, তা' হলে আমার কোটি জীবন তাঁহার কার্য্যে উৎসর্গ করিলেও সে মহাপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

---

(৭)

কয়েক মাস পরে সনাতন, সিবিল সারভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিয়া আগে বার্ড সাহেবের গৃহে আসিলেন। সাহেব অভ্যর্থনা করিতে দ্বারে দণ্ডায়মান। সাহেব অভিবাদন করিলেন; কিন্তু সনাতন প্রত্যভিবাদন করিলেন না,—পলকশূন্য নয়নে সাহেবের পানে চাহিয়া নীরবে দাড়াইয়া রহিলেন। গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল—সমস্ত দেহ কাঁপিতে থাকিল। তা'র পর সাহেবের পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ বলিলেন, "সাহেব, হিন্দুরা দেবতাকে এইরূপে অভিবাদন করে।" সাহেব আদরভরে সনাতনকে বুকে টানিয়া লইলেন।

* * *

তা'র পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। সনাতন মিত্র এক্ষণে এস্, মিট্রা ও জেলার জজ। যে

জেলাতে বার্ড সাহেবের বাস, সেই জেলাতে মিট্রা সাহেব এক্ষণে জজ। একদা মিট্রা সাহেব শুনিলেন, বার্ড সাহেব একজন যুবতী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না—লোকেও বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলাবলি করিল, "মিষ্টার বার্ড নিষ্কলঙ্ক, দেবচরিত্র—মেমসাহেব, যুবতীকে স্বামীর প্রেমাসক্ত বিবেচনা করিয়া অকারণ হত্যা করিয়াছেন।"

সে যাই হউক, মিট্রা সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না,—স্ত্রীকে লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সেখানে তখন পুলিস আসর জমকাইয়া বসিয়াছে। মিষ্টার বার্ড কিন্তু নীরব। পুলিসের সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—"আমাকে ফাটকে লইয়া চল, আমি খুন করিয়াছি।" পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন খুন করিয়াছেন?" বার্ড সাহেব সে প্রশ্নের কোনই উত্তর দিলেন না। না দিলেও পুলিস সাহেবের মনে ধারণা জন্মিল যে, মেম সাহেবই প্রকৃত হত্যাকারী—মিষ্টার বার্ড স্ত্রীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাই তিনি বার্ডকে ছাড়িয়া তাঁহার স্ত্রীকে আসামী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

এমন সময় মিট্রা সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত হইলেন। পুলিস সাহেব সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাড়াইলেন; কিন্তু মিষ্টার বার্ড উঠিলেন না—একটি কথাও কহিলেন না,—নীরবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। পুষ্প ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাড়াইল, এবং স্নেহ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

সাহেব পুষ্পের পানে চাহিয়া দেখিলেন না—একটা কথাও কহিলেন না; পুলিস সাহেবকে শুধু বলিলেন, "আমাকে যদি এখনি জেলখানায় না লইয়া যাও, আমি আত্মহত্যা করিব।"

পুলিস সাহেব মোকদ্দমা রুজু করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীকে প্রেরণ করিলেন। কলিকাতা হইতে একজন ব্যারিষ্টার আসিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। কে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে লোকে তা জানিল না; বলাবলি করিল,—"এত বড় কৌঁসিল তাহাদের দেশে পূর্ব্বে আর কখন আসে নাই।" কৌঁসিল যত বড়ই হউন না কেন, তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। করিবার যো কি? আসামী আদালতগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন ব্যারি-ষ্টারকে বলিল,—"কে তুমি? আমি তোমাকে চাই

না—তুমি দূর হও,” তখন ব্যারিষ্টার সাহেব আর কি করিতে পারেন? আবার যখন সাক্ষীরা হলপ লইয়া বলিতে লাগিল, “বার্ড সাহেব খুন করেন নাই—মেম সাহেব খুন করিয়াছেন,” তখন আসামী গর্জ্জন করিয়া বলিল, “মিথ্যা কথা! আমি খুন করেছি।” ম্যাজিষ্ট্রেট নিরুপায় হইয়া মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন।

দায়রার জজ মিট্রা সাহেবের কাছে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। কলিকাতার বড় কৌসিল, জেলার সমস্ত উকিল, আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কৌসিল বলিলেন,—“আসামী নিরপরাধ।” আসামী তদুত্তরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “না, আমি নিরপরাধ নই—আমি হত্যা করেছি।” কৌসিল বলিলেন,—“আসামী ক্ষেপিয়াছেন।” ডাক্তার সাহেব সাক্ষ্য দিলেন,—“আসামী ক্ষেপেন নাই—সম্পূর্ণ সজ্ঞান।”

দুই তিন দিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিল। দুই তিন দিনের পর জজ সাহেব রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বয়ং রায় পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন আদালত-গৃহ নিস্তব্ধ; উকীল, ব্যারিষ্টার, জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে জজের মুখ পানে চাহিয়া আছে। জজের কিন্তু বিকার

নাই,—স্থির, নিষ্কম্প। তিনি অবিকম্পিত কণ্ঠে জজ্‌মেণ্ট পাঠ করিয়া অবশেষে আদেশ দিলেন,—"আসামী জর্জ্জ বার্ড, তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।"

তাঁহার বাক্য অবসান হইতে না হইতে বন্দুকের শব্দে আদালত-গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে সভয়ে জজ সাহেবের পানে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, তাঁহার রক্তপ্লুত দেহ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতেছে। সকলে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল; আসামীও এক লম্ফে জজ মিট্টার সমীপস্থ হইলেন। এবং তাঁহার রক্তপ্লুত দেহ বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"পুত্র সনাতন, এ কি করিলে? আত্মহত্যা!'

মুমূর্ষু একবার চাহিয়া দেখিল—উত্তর করিতে পারিল না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বার্ড সাহেব বলিলেন,—"জন্মজন্মান্তরে যেন তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র পাই!"

ক্ষুদ্র কথা।

আমি।

—·—

ছি ছি ছি! আমি কর্‌ছি কি? আমার এই নবীন বয়স, এত রূপ বৃথা যাইতে বসিল! আমি কেন যৌবন ভোগ করি না—রূপ জগৎকে দেখাই না, তা' হ'লেত আমার সকলি সার্থক হ'ল মাথার উপর মণিমুক্তা-খচিতচন্দ্রাতপতুল্য তারকাবিভূষিত নীলাকাশ—পদনিম্নে বাসনাপ্রবাহতুল্য পূর্ণযৌবনা জাহ্নবী; মধ্যে আমি,—বিকসিত যৌবনের চাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া মধ্যে আমি। আকাশ গরবে ফুলিয়া উঠিয়া, জগতকে আপন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছে—ভাগিরথী যৌবন-চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া শস্যশষ্পসমাচ্ছন্নক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে আমি কেন নীরব থাকি? আমি কেন রূপের তরঙ্গে জগতকে প্লাবিত না করি?—বাসনার প্রবাহ ছুটাইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের জ্বালা পরিতৃপ্ত না করি?

জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী,—আকাশ পৃথিবী হাসিয়া উঠিয়াছে। যেখানে যা' কিছু সৌন্দর্য্য লুকান ছিল, সব অন্ধকার ছাড়িয়া জগতের নয়নসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ ঘোমটা টানে নাই, সঙ্কোচ করে নাই,—রূপের ডালা মাথায় করিয়া গরবে ফুলিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে! আমিও কেন হাসি না?—ঘোম্‌টা টানিয়া ফেলিয়া, জগতের নয়নসমক্ষে রূপের ডালা মাথায় করিয়া দাঁড়াই না কেন?

তোমরা বলিবে, আমি হিন্দুকুলবধূ—বালবিধবা,—আমাকে পরদা ছাড়িয়া জগতের সমক্ষে দাড়াইতে নাই—রাজহংসীর ন্যায়, বাসনার প্রবাহে দেহ ভাসাইয়া ছুটিতে নাই। কেন নাই? তুমি পার, আমি পারি না? তুমি শাস্ত্রকার, বিপত্নীক হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কর; গ্রহণ করিয়াও অন্য রমণীতে আসক্ত হও। এই কি তোমার সংযম? সংযমী না হইয়া সংযম শিখাইতে চাও? ছি ছি! বৃথা তোমার হবিষ্যান্ন, বৃথা তোমার শিক্ষাদান! আমি তোমার কথা শুনিব না।

কেনই বা শুনিব? ভগবান আমাকে রূপযৌবনৈশ্বর্য্য, ভোগ-স্পৃহা লালসা সকলি দিয়াছেন; তবে কেন আমি হবিষ্যান্ন খাইয়া, কম্বলাসনে একাকিনী শুইয়া দরিদ্র

ভিক্ষুকের ন্যায় দিনযাপন করি? যা'র যৌবন গিয়াছে, সে হরিনামের মালা হাতে করুক—যা'র রূপ নাই, সে মুখের উপর ঘোম্‌টা টানুক—যে দরিদ্র, সে কদর্য্য অন্ন খাইয়া দেহ পুষ্ট করুক। আমি কেন করিব? আমার কিসের অভাব? আমি ইচ্ছা করিলে জগতের আহার্য্য একত্র করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারি—যৌবন-নদে তরঙ্গ ছুটাইয়া আকুল লালসানল শান্ত করিতে পারি। তবে কেন আমি অসংযমীর মুখে সংযমের শিক্ষা লইয়া আজীবন জ্বলিবা পুড়িয়া মরিব?

আবার সেই কথা! পরোপকার! বারম্বার সেই উপদেশ দিতেছ? কেন আমি তা' করিব? তোমার উপকারে আমার লাভ কি? তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত—তুমি অবিবাহিতা কন্যা লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত, আমার তা'তে কি? তোমার মা স্বর্গে গেল বা না গেল,—তোমার অরক্ষণীয়া কন্যা পাত্রস্থা হ'ল বা না হ'ল, আমার তা'তে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? হাসপাতালের অভাবে ঔষধ না পাইয়া তোমরা দলে দলে মরিয়া যাইতেছ—এই দুর্ভিক্ষের দিনে এক মুঠা অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পালে পালে মানুষগুলা মরিতেছে; আমি মনে করিলে আমার অগাধ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে দেশে দেশে

হাঁসপাতাল স্থাপন করিতে পারি—গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র খুলিতে পারি। কিন্তু কেন তা' করিব? তোমরা বাঁচ বা মর, তা'তে আমার লাভালাভ কি? যাহারা রুগ্ন, পীড়িত—যাহাদের অর্থ নাই, অন্ন নাই, তাহাদের মরিয়া যাওয়াই উচিত,— আমি তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারিব না।

জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নিশি। আমার ফুলের বাগান হাসিয়া উঠিয়াছে। আমি সেই পুষ্পোদ্যান মধ্যে মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপর শুইয়া ফুলের শোভা দেখিতে লাগিলাম। কত রকমের কত ফুল। কোনটা সুইট-পিয়ার, কোনটা বা পলনিরো, কোনটা মালতী, কোনটা বা মাধবী। কোথাও বেল ফুটিয়াছে—কোথাও বা বকুল ফুটিয়াছে। কোন স্থানে রজনীগন্ধা—কোন স্থানে চন্দ্র-মল্লিকা; কোথাও জুঁই—কোথাও চাঁপা; এখানে বোগেনভিলা—সেখানে সেফালিকা; কোথাও জেস্মিন—কোথাও মল্লিকা ফুটিয়া উঠিয়া গন্ধরাশি বিস্তার করিতেছে। আমি সেই সুগন্ধামোদিত, মলয়ানিল-সেবিত, নক্ষত্রপ্রফুল্ল নীলাকাশতলে শুইয়া আমার বাসনামুখরিত হৃদয়ের কোমল আরাব শুনিতে লাগিলাম।

আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কে নিশীথিনীর কোমল অঙ্কে শুইয়া দূরহইতে গাহিতেছে—

সুদূর আঁখির আড়ে কে গায় বিষাদ গান ;'
স্মৃতির তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিয়া আসিছে তান।
না হ'তে যৌবনোদ্গত
জীবনের সাধ যত
বায়ুমুখে ফুল মত অকালে দিতেছে প্রাণ ;
জীবন ফুরায়ে গেল শুনিতে শুনিতে বিষাদ গান ॥

গান শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইল, আমি যেন ঘুমঘোরে—অথবা স্বপ্নে, ঠিক তা' বলিতে পারি না—আমি যেন আমার দেহ ছাড়িয়া কোন এক অপরিচিত দেশে * আসিয়া পড়িয়াছি। দেহ ছাড়িয়া বেশী দূর আসি নাই—বাগানের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, অথচ আমার ধারণা হইল, আমি যেন কোন এক অজ্ঞাতরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিলাম, অদূরে বেদীর উপর আমার দেহ—রত্নালঙ্কার-বিভূষিত পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে ; দাসীরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আমার খোলস বা আবরণটাকে বীজন করিতেছে। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম।

আমি বিস্মিত অন্তরে শৃঙ্খলমুক্তা হরিণীর ন্যায় উদ্যান মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পলনিঁরোর কাছে

* Astral world.

গিয়া দেখি, তা'র ভিতর একটা বিবস্ত্রা যুবতী বসিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?"

যুবতী নিরলঙ্কারা; উত্তর করিল, "আমি ক্লিওপেট্রা; রূপ ও ঐশ্বর্য্যে একদিন আমি ভুবনবিখ্যাত ছিলাম। বাসনার তরঙ্গে গা ভাসাইয়া আজীবন প্রবৃত্তির সেবা করিলাম; কিন্তু কখন তৃপ্তি বা শান্তি পাইলাম না। এখন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "মিথ্যা কথা! ভোগে নিঃসন্দেহ তৃপ্তি।"

আমি সেখানে আর দাঁড়াইলাম না—বকুলের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, পাতার নল কাণে গুঁজিয়া একটা পুরুষ মানুষ ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি পত্রিকা সম্পাদক। আমার মাসিক প্রকাশের কোন ত্রুটি ছিল না—প্রবন্ধ নিঃসরণেরও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু আমার গ্রাহক জুটিল না। আমি নিজে লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারি না। তা' সংসারে পাঁচজন ত আছে; তবে আমার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় কেন? আমার বাসনা ছিল, পত্রিকাখানা কোন রকমে চালাইয়া অর্থ ও নাম

করিব। কিন্তু আমার কপাল গুণে দেনার জ্বালায় কাগজখানা বিক্রীত হইয়া গেল। হায়, আমার অর্থ সঞ্চয় হইল না—যশও হইল না,—আমি শুধু আকুল বাসনারাশি হৃদয়ে ধরিয়া ছুটাছুটি করিয়া মরিলাম।”

সম্পাদকের নিরাশ হৃদয়ের ব্যথা শুনিতে শুনিতে আমি রজনীগন্ধার কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, একটা অন্ধ, দন্তহীন পুরুষ মানুষ হামাগুড়ি দিয়া গাছের তলায় বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে একটা বড় চাকুরে ছিল; কখন কলিকাতায়, কখন বা মফঃস্বলে ফুটিত। উন্নতির আশায় প্রলুব্ধ হইয়া দুষ্টের পালন শিষ্টের দমন করিয়া আসিয়াছে। চোখ বুজিয়া ন্যায়কে দমন করিত বলিয়া সে চক্ষু হারাইয়াছে—ফলের আশায় গাছের তলায় তলায় বেড়াইত বলিয়া পা হারাইয়াছে। এখনও—এই বিষহীন অবস্থাতেও আশা ছাড়িতে পারে নাই, তাই আজও ফুল বা ফলের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এ সব জীবকে দূরে রাখিয়া জেস্‌মিনের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, সাইলক্-প্রভু নিক্তি হস্তে সুদ মাপিতেছেন, আর মৃদুস্বরে এক দুই তিন

গণনা করিয়া যাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

উত্তর হইল, "আমি—এক, দুই, তিন—সাইলক্—এক, দুই—"

প্রশ্ন। কি গণিতেছ?

উত্তর। সুদ—এক, দুই, তিন।

প্রশ্ন। কত টাকা করিয়াছ?

সাইলক্ উত্তর না দিয়া একটু হাসিল মাত্র। আমি তাহার হাসির অর্থ বুঝিলাম। বুঝিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলাম এবং সেফালিকার তলায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সেফালিকা-গিন্নি হাসিয়াই আকুল। কিন্তু সে হাসির অর্থ বুঝিতে না বুঝিতে আমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। কে আমায়—কোন এক প্রবল শক্তি আমায় টানিয়া লইয়া চলিল। যে স্থানে আমার দেহ পড়িয়া ছিল, সে স্থানে বিদ্যুদ্বেগে আসিলাম। দেখিলাম—যাহাকে আমি সুখের উপকরণ বলিয়া মনে করি, সেই নবীন যুবা পুরুষ আমার পতিত দেহটা ঠেলিয়া, আমায় জাগ্রত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। চক্ষু উন্মীলিত

করিয়া দেখি, মাথার উপর নক্ষত্র খচিত নীলাকাশ। চারিদিকে গাছ পালা। সাইলক্ বা ক্লিওপেট্রা কাহাকেও দেখিলাম না। পদতলে একজন কে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে চিনিলাম,—সে আমার মনোমোহন নবীন যুবা পুরুষ। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে বেদীর উপর উঠিয়া বসিলাম।

পরমুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলি আসিয়া আমার ললাট ভেদ করিল। আমি হতচৈতন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলাম।

ক্ষণপরে একটু উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, আমার রক্তাক্ত দেহ ধরাপৃষ্ঠে লুটাইতেছে; আমার জনৈক আত্মীয় বন্দুকহস্তে নিকটে দণ্ডায়মান। দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে আমার দেহ লুক্কায়িত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। উদ্যা-নের একাংশে একটা গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে দেহ নিক্ষেপ করিবার আয়োজন হইতেছিল। আমি ভাবি-লাম, এইবার দেহের ভিতর ফিরিয়া যাই। চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না।—যেন, কোন এক অনি-বার্য্য কারণে, যেন কোন এক অলঙ্ঘনীয় শক্তি প্রভাবে আমি বিফলমনোরথ হইলাম। যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম—যখন বেদীর উপর দেহ রক্ষা করিয়া উদ্যানময় পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন ত বিনা চেষ্টাতেই দেহ

মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলাম। এখন পারিতেছি না কেন? এখন কি দেহের মৃত্যু ঘটয়াছে? মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়াই কি আমি পুনরায় দেহাবলম্বন করিতে পারিতেছি না? নিদ্রা ও মৃত্যুতে কি এই প্রভেদ? সুপ্তাবস্থায় আমার সহিত দেহ যে সামান্য সূত্রে আবদ্ধ ছিল, সে সূত্রটুকু বুঝি এখন কাটিয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া নিদ্রা ও মৃত্যুতে আর ত কোন প্রভেদ দেখি না।

আমি সচকিতে দেখিলাম, আমার দেহ প্রোথিত না করিয়াই আমার আত্মীয় সভয়ে পলায়ন করিল। কারণটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, আমার দেহের অনুরূপ আর একটা দেহ[*] আমার পরিত্যক্ত দেহের সন্নিকটে শূন্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, এই নবদেহটা বায়বীয়; কিন্তু দেখিতে ঠিক আমার পার্থিব দেহের মত। উভয় দেহের ললাট রক্তাক্ত—বন্দুকের গুলিতে আহত। বিস্মিত নয়নে দেখিলাম, এই নব দেহটা বায়ু হিল্লোলে ক্রমে মিলাইয়া গেল। কিন্তু আমার আত্মীয় আর ফিরিয়া আসিল না,—'ভূত' মনে করিয়া 'রাম' 'রাম' করিতে করিতে সভয়ে পলাইল।

[*] Etheric double.

কোথায় চলিলাম ?

—— o ○ o ——

দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সীমাহীন বারিধির উপর ক্ষুদ্র নৌকায় ভাসিয়া যাইতেছি। কোথায় যাইতেছি জানি না—কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে জানি না। সম্মুখে, পাশে, পিছনে কেবল স্তূপাকার অন্ধকার; পদনিম্নে—অপরিজ্ঞাত অনন্ত জলরাশি।

আমার নৌকায় আমি একা; মাঝি নাই, মাল্লা নাই, আমি একা। আমার পিছনে কামিনী বাবুর নৌকা, তাহাতে তিনিও একা। আমার আগে তারার নৌকা, তা'র আগে হরির নৌকা। আমরা চারিজন চারিখানা নৌকায় অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছি। কাহার ডাকে. কাহার তাড়নায় যাইতেছি জানি না;

কেবল বুঝিতেছি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট পথে আমরা অগ্রসর হইতেছি।

এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠিল। আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু হরি চক্ষু খুলিল না, চীৎকারও করিল না। সে বুঝিল না যে, ঝড় উঠিয়াছে। সে বুঝিল না যে, ঝড়ের আঘাতে ক্ষুদ্র তরী অচিরে ডুবিয়া যাইবে।

অন্ধকারে নৌকা ডুবিল। আমরাও ডুবিলাম। জীবন রক্ষার্থ যে চেষ্টা করিলাম তাহা বৃথা হইল। অচিরে আমার জীবাত্মা একটা স্থূলদেহ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিল। আমার বায়বীয় বা আতিবাহিক শরীর অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তোমরা যাহাকে ভুতপ্রেত বল, আমি তখন তাহাই হইলাম। আমার কথা পরে হইবে ; এক্ষণে অন্যান্যের কথা বলি।

---

(১)

দেখিলাম, কামিনী বাবুর জীবাত্মা আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ঊর্দ্ধে উঠিতেছ না কেন ?"

সে বলিল, "আমার ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা নাই— আমায় কীট-যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কামিনী বাবু, তুমি কীট যোনি প্রাপ্ত হইবে কেন?"

কামিনী উত্তর করিল, "আমি মহাপাপিষ্ঠ ছিলাম— কখন পুণ্য কার্য্য করি নাই। তাই আমার এ অবনতি ঘটিয়াছে। জানি না কত যুগ যুগান্তরের পর আবার মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হইব।"

---

(২)

ঘৃণার সহিত সে দিক্ হইতে ফিরিলাম। অগ্র হইয়া দেখিলাম, তারার জীবাত্মা কোন স্থূলদেহ (অর্থাৎ বায়বীয় জগতের কোন বস্তু) অবলম্বন করিয়া তারার শরীর ত্যাগ করিয়াছে। তারার এই আতিবাহিক দেহ ক্রমে অন্তরীক্ষে উঠিতে লাগিল। তাহার এই দেহ ও আমার বায়বীয় দেহ ভিন্ন জাতীয়। দেখিতে দেখিতে তারার আতিবাহিক দেহ সূর্য্যকিরণে আকৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম, "তারা, আমি তোমার মত উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছি না কেন? তুমি কোথায় যাইতেছ?"

তারা বলিল, "ভাই, সকলই কর্ম্মফল। আমি যাগ যজ্ঞ করিয়াছিলাম; বাপী, কূপ, তড়াগাদি উৎসর্গ করিয়াছিলাম, পরের উপকার সাধ্যমত করিয়াছিলাম, তাই আমি স্বর্গে যাইতেছি।"

আমি। কতদিনে সেখানে যাওয়া যায়?

তারা। এক বৎসরে।

আমি। তুমি যেখানে যাইতেছ, সেখানে গিয়া কি করিবে?

তারা। সেই লোকের শরীর ধারণ করিব।

আমি। অনন্তকাল কি সেখানে থাকিবে?

তারা। না, ভোগান্তে আবার এই পৃথিবীতে ফিরিব।

আমি। কেমন করিয়া আবার ফিরিবে?

তারা। বৃষ্টি-ধারার সাহায্যে।

আমি। ফিরিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিবে?

তারা। হাঁ, জন্মগ্রহণ করিতে আবার লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। সম্ভবতঃ সে বার অপেক্ষাকৃত ভাল জন্ম পরিগ্রহ করিব।

আমি। তুমি ধার্ম্মিক ছিলে, কেন তোমার মুক্তি ঘটিল না?

তারা। মুক্তি কাহাকে বলিতেছ?

আমি। জীবাত্মার মুক্তি।

তারা। সেটা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আমি। সম্ভব নয় কেন?

তারা। জীবাত্মা কি তা' জান?

আমি। সূক্ষ্মদেহ ও চৈতন্যের সংযোগ।

তারা। বেশ; যদি জড় ও চৈতন্য স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুক্তি সম্ভব। যে হেতু পুনঃস্বাতন্ত্রী মুক্তি।

আমি। স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয় নাই কি?

তারা। চেতন অচেতন, স্থাবর অস্থাবর সকল পদার্থেই যখন জড় ও চৈতন্য একত্র ও অবিযুক্ত অবস্থায় থাকিতে দেখিতেছি, তখন কেমন করিয়া বলিব, মনুষ্যদেহে জড় ও চৈতন্য স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে?—ভাই, আর থাকিতে পারিতেছি না।—চলিলাম।

---

(৩)

তারা চলিয়া গেল। হরির পানে ফিরিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, তাহার জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরি, তুমি কোথায় যাইতেছ?" হরি কোন উত্তর করিল না। তদ্দৃষ্টে তারা দূর হইতে বলিল, "হরি সাধনা বলে বাসনা ত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।"

আমি। এই কি মুক্তি?

তারা। হাঁ, এই মুক্তি। এ মুক্তিতে সুখদুঃখ উভয় জ্ঞান থাকে না।

আমি। কাহার পক্ষে এ মুক্তি সম্ভব?

তারা। যাঁহারা জ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ, সাধক। যাঁহারা সকল বাসনা, সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে তন্ময় হইয়াছেন।

আমি। বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্যের এরূপ মুক্তি ঘটিয়াছিল কি?

তারা। সম্ভবতঃ ঘটে নাই; কারণ, তাঁহাদের ত্রিপুটি লয় হয় নাই। যাঁহাদের ত্রিপুটি লয় হয়, তাঁহাদের লিখিবার বা উপদেশ দিবার সম্ভাবনা থাকে না।

(৪)

সকলে চলিয়া গেল। আমি অন্তরীক্ষে ভূতপ্রেতরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম, অন্তরীক্ষে অসংখ্য, অগণ্য আতিবাহিক দেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার বাড়ী বীরভূমে ছিল। আমার কয়েকটি পুত্র কন্যা ছিল। বিষয় কর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া পরের অনিষ্ট করিয়াছি, উপকারও করিয়াছি; কাহারও লইয়াছি, কাহাকে দানও করিয়াছি। অন্ধ-আতুরকে কখন কখন পয়সা দিতাম, ঠাকুর-দেবতা দেখিলে প্রণাম করিতাম। আবার এদিকে একটু অন্যায় করিয়া দু'পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাতেও বিরত হইতাম না।

আমার শ্রাদ্ধ এবং এক বৎসরের পর সপিণ্ডকরণ হইয়া গেল। পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু গর্ভাশ্রয় না পাইলে জন্মিতে পারি না। আমার ইন্দ্রিয়াদি আছে,—অথচ আমি সংসারে জন্মিতে পারিতেছি না। জন্মিতে না পারিয়া আমার যাতনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে আমার আগেকার জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভাশ্রয় করিয়া আমি সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলাম।

আমার দুই স্ত্রী।

ঘরে চলেছি। পথ অনেকটা ; তা'ও আবার সুগম নয়। ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম রাস্তা। পথে নিয়তই লোক চলা-ফেরা করে, তবু পথের দাগ নাই। কখন পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া দুরারোহ পর্ব্বতের শিখর দেশে উঠিয়াছে, কখন বা মকর-কুম্ভীর-সমাকুল তরঙ্গ-বিক্ষেপী নদী হৃদয়ে মিশিয়াছে। পথ-মধ্যে কোথাও বা পান্থশালা, আবার কোথাও বা অনন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। কখন ব্যাঘ্র-ভল্লুকের গর্জ্জন, কখন বা প্রাণ-মন-মুগ্ধকর দূরাগত মধুর সঙ্গীত। কখন ভয়, নিরানন্দ ; কখন বা উৎসাহ, আশা। এইরূপে পথ অতিক্রম করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছি।

সঙ্গে দুই স্ত্রী। তা'রা সঙ্গ ছাড়ে না। যেখানে যাই, তা'রা সঙ্গে যায়। বড় বউ বড় গম্ভীর। তা'কে তত ভাল লাগে না। সময়ে অসময়ে গম্ভীর মুখে কেবল

উপদেশ দেয়। তা'কে ভালবাসি, ভয়ও করি। ছোট বউএর কথা স্বতন্ত্র। সে হাস্যমুখী, মনোমোহিনী; কিন্তু বড় বউয়ের প্রতি ব্যবহারে একটু যেন কুটিল, একটু যেন গরল-বর্ষিণী। বড় বউ যখন আমাকে কোন উপদেশ দিতে আসে, তখন ছোট বউ জ্বালাময়ী তীব্র ভাষায় বেশ দু'কথা তাহাকে শুনাইয়া দেয়। বড় বউ সংযত ভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করে। ছোট আরও গর্জ্জিয়া উঠে। তখন আমাকে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে হয়। কখন বড় বউএর কথা শুনি, কখন বা ছোট বউএর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলি। তবে, ছোট বউএর কথাটা অধিকাংশ সময় প্রবল থাকে।

ঝগড়া মিটাইতে মিটাইতে আমার সময় যায়; পথ যে বড় একটা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছি তা' নয়। অতিক্রম করা দূরে থাকুক, কখন কখন ঘুরিয়া ফিরিয়া পিছাইয়া যাইতেছি। পথ আমার জানা নাই; যে পথে বড় বউ, ছোট বউ আমায় লইয়া যাইতেছে সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি।

একদিন ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক পান্থশালায় উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁগা, কোন্ পথ ধরিয়া যাইব?"

গৃহস্বামী। কোথায় যা'বে?

আমি। মুক্তিপুর।

গৃহ। পথ ভুল করিয়াছ।

আমি। তবে কোন্ পথ ধরিব?

গৃহ। পথ ঠিক আমি জানি না; তবে একজন জানে।

আমি। সে কোথায়?

গৃহ। নিকটে এক কূপ মধ্যে পড়িয়া আছে। তাহাকে উদ্ধার করিয়া পথ জানিয়া লইতে পার।

শুনিয়া বড় স্ত্রী বলিল, "পথ জানিতে পার বা না পার, আগে তাহাকে উদ্ধার কর।" ছোট বউ অমনই গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল, "তোর যেমন কথা! উদ্ধার বলিলেই অমনই উদ্ধার করা হয়? সে একটা গভীর কূপের মধ্যে পড়ে আছে—কে আপনার জীবন বিপন্ন ক'রে কূপের ভিতর নামিবে?"

আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবৃছ কি?"

আমি সে কথার কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কূপের ভিতর নামিবার কোন পথ বা উপায় আছে?"

গৃহ। পথ থাকা দূরে থাক্, কূপের তলাও দেখা যায় না।

ছোট বউ আরও যো পাইল। সে গলা মোটা করিয়া বলিল, "শুন্‌লি? এখন ইচ্ছা হয়, স্বামীকে যমের মুখে দিগে। পরের উপকার কর্‌তে গিয়ে নিজের জান্‌টা দিতে হ'বে?"

ছোট বউএর কথাটা আমার মনে লাগিল। আমি সেখানে আর দাঁড়াইলাম না; পান্থশালা ছাড়িয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। সেখানে কোন পথ নাই। আপন মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পথ ত দেখি না,—এক্ষণে কোন্ দিকে যাই?"

ছোট বউ কোমর বাঁধিয়া বলিল, "আমি তোমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি—ভয় কি?"

বড় বউ অভিমান ভরে মনে মনে গর্জ্জিতেছিল। সে বলিল,—"যে দিকে যাইতেছ, সে দিকে পথ কোথা? ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পান্থশালায় যাইতে চাও ত ছোট বউএর নির্দ্দেশিত পথ ধর।"

বড় বউকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোন্ পথে যাইতে বল?"

বড় বউ পাশের একটা পথ নির্দ্দেশ করিল। পথটা

কণ্টকাকীর্ণ, দুরারোহ পর্ব্বতচূড়ার উপর দিয়া গিয়াছে। আমি ভীত হইয়া ছোট বউএর নির্দ্দেশিত পথ পানে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, পথটী আঁকিয়া বাঁকিয়া পুষ্পবনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আমি মুগ্ধ হইয়া সেই পথ ধরিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার ভ্রম দেখিতে পাইলাম—আমি আবার সেই পান্থশালায় আসিয়া উপনীত হইলাম।

ছোট বউএর উপর রাগ করিয়া এবার বড় বউএর নির্দ্দেশিত পথ ধরিলাম। কিন্তু পাহাড়ে উঠিতে সাহস হইল না; পর্ব্বত-পদতলে অবসন্ন-দেহে বসিয়া পড়িলাম। ছোট বউ বলিল, "কেমন, এইবার পাহাড়ে উঠ। বড় সোজা রাস্তা, নয়?"

বড় বউ উত্তর করিল, "রাস্তা সোজা নয়, তা' আমিও জানি। কিন্তু, যখন দু'চারটা পাহাড়, পাঁচ সাতটা জঙ্গল, দশবিশটা নদী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'বে, তখন সম্মুখে সুন্দর, সুগম রাস্তা দেখ্‌তে পা'বে।"

ছোট বউ বলিল, "এই সব পাহাড়, নদী পার হ'লে তবে ত ভাল রাস্তা পা'ব? কাজ নেই আমার ভাল রাস্তায়, প্রাণটা থা'ক্‌লে অনেক ভাল রাস্তা জুট্‌বে।"

বড় বউ বলিল, "অনেক দূরে থাকুক, একটা রাস্তাও জুটিবে না। যতদিন না বাসনা বিলাস বর্জ্জন করিতে শিখিবে—ভয়-দুঃখের অতীত হইতে পারিবে, ততদিন মুক্তিপুরের নিকটেও যাইতে পারিবে না।"

ছোট বউ বলিল, "তোর ও-সব কটমটে কথা রেখে দে। এখন আমার ক্ষিদে পেয়েছে—খাবার উপায় দেখ্।"

এমন সময়ে সাম্‌নে একটা খরগোস দেখিতে পাইলাম। ছোট বউ বলিল,—"আমাকে ঐ খরগোসটা মেরে দেও; আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

আমি তৎক্ষণাৎ ধনুকে তীর যোজনা করিলাম। বড় বউ আমার হাত চাপিয়া ধরিল; বলিল, "ছিঃ, প্রাণী হত্যা করিও না।"

ছোট বউ আর কোথায় আছে! ঝড়বেগে চামুণ্ডা মূর্ত্তিতে বড় বউএর ঘাড়ে পড়িল। সে বেচারি বলিল, "আগে বুঝাইয়া দাও, আমার অপরাধটা কি হইয়াছে।"

ছোট বউ। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, তুই কেন খেতে দিবিনি না?

বড়। তাই বলে কি একটা প্রাণী মেরে ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্‌তে হ'বে?

ছোট। তবে কি না খেয়ে আমি মর্‌ব?

বড়। একবেলা না খাইলে মানুষ মরে না।

ছোট। খরগোষের মাংস খেতে কত ভাল, তা' তুই জান্‌বি কি?

বড়। সামান্য রসনা-তৃপ্তির জন্য একটা প্রাণী-বধ কর্‌তে চাও? ছিঃ!

ছোট। তা'তে দোষ কি? ওটা একটা ছোট খরগোষ বইত নয়!

বড়। ভগবানের চক্ষে ছোট বড় সব সমান। একটা হাতী যদি তোমায় মারে, তোমার কেমন লাগে বল দেখি?

ছোট। আঃ মর! তুই আমায় গাল্‌ দিবি কেন্‌ লা? তোর মত কুঁদুলে আমি কোথাও দেখি নি।

ঝগড়া মিটিবার পূর্ব্বেই খরগোষ অন্তর্হিত হইল; আমি তখন বিরক্ত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম; এবং জঙ্গল ছাড়িয়া গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে যাইবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার নয়নে পড়িল। একজন মহাজন বা পাওনাদার দেনার দায়ে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। বেচারার তৈজস-পত্র সকলি লইয়াছে, অবশেষে তাহার নিঃসম্বল

স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয়চ্যুত করিতেছে। দেখিয়া বড় বউএর হৃদয় গলিয়া গেল। পাওনাদারকে নিবৃত্ত করিতে সে আমাকে অনুরোধ করিল। আমি তাহার উপদেশ মত পাওনাদারকে পাক্‌ড়াও করিলাম; বলিলাম, "গরীবদের ঘর হইতে তাড়াইয়া তোমার লাভ কি হ'বে? তৈজসপত্র, টাকা-কড়ি যাহা কিছু ছিল, সকলই লইয়াছ; এখন কেন এই অনাথ, নিরাশ্রয়দের গাছতলায় তাড়াইয়া মার?"

মহাজন বলিল, "আমার পাওনা টাকা দিলেই আমি ঘর ছাড়িয়া দিয়া যাই।"

আমি। তাড়াইয়া দিলেই কি তোমার পাওনা টাকা মিলিবে?

মহাজন। না মিলে তোমার কিহে বাপু?

ছোট বউ আমার কাণে কাণে বলিল,—"সে কথা ত ঠিক। তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?"

আমি নিরস্ত হইতেছি দেখিয়া, বড় বউ বলিল, "জিজ্ঞাসা কর, কত টাকা পাইলে মহাজন ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। মহাজন উত্তর করিল, "তোমার দুই স্ত্রীর সমস্ত গহনাগুলি যদি খুলিয়া দিতে

পার, তা' হ'লে ঘর-বাড়ী, তৈজস-পত্র সব ছাড়িয়া দিতে পারি।"

বড় বউ তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার খুলিয়া দিতে উদ্যত হইল; কিন্তু ছোট বউ কিছুতেই রাজি হইল না। বড় বউ অনেক বুঝাইল; বলিল, "সামান্য গহনার বিনিময়ে একটী দরিদ্র পরিবারকে আশ্রয় দিতে পারিবে, এর চেয়ে আর আনন্দ কি আছে? তুমি কেন অমত করিতেছ?"

ছোট বউ গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল, "ও আশ্রয় পেলে বা না পেলে তা'তে আমার কি? আমার এত টাকার গহনা, আমি দিব কেন, বল্ দেখি?"

বড় বউ। গহনা আর কতদিন পরিবে? দু'দিন বাদে সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আজ এই অনাথ পরিবারকে আশ্রয় দিলে তুমি যে আনন্দ পাইবে, সে আনন্দটুকু অবিনশ্বর—সে টুকু তোমার সঙ্গে যাইবে।

ছোট বউ গহনা ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। বড় বউও ছাড়ে না। তখন দুই বউএর মধ্যে বেশ ঝগড়া লাগিয়া গেল। ঝগড়া আর থামে না; অবিরাম চলিতে লাগিল। দেখিয়া মহাজন আমাকে বলিল, "হাঁগা, এই রকম কি প্রত্যহ ঝগড়া চলে?"

আমি। প্রত্যহ কি বল্‌ছ! অহর্নিশ চল্‌ছে।

মহা। তুমি থামাতে পার না?

আমি। আমার সাধ্য কি?

মহা। চেষ্টা করেছ?

আমি। তা বড় একটা করিনি।

মহা। এ স্ত্রী দুটি পেলে কোথা?

আমি। পা'ব আর কোথা! বাবা জুটাইয়া দিয়াছেন।

মহা। বেশ, বেশ! পত্নীদ্বয়ের নাম কি?

আমি। কত লোকে কত কি নাম ধ'রে ডাকে

মহা। তুমি কি বলে ডাক?

আমি। বড় বউটিকে আমি বিদ্যা ব'লে ডাকি।

মহা। ছোটটি বুঝি অবিদ্যা?

আমি। হাঁ।

মহা। বেশ, বাবা, বেশ! তোমার বিদ্যা, অবিদ্যা নিয়ে এখন স'রে পড়, আমায় আর জ্বালিও না।

আমি সরিয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার ঘর যাওয়া আর হ'ল না। ঝগড়া মিটাইতে মিটাইতেই আমার দিন গেল।

কিন্তু।

—+—

"কিন্তু"টাকে নিয়ে আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। তোমরা কেহ আমার উপায় কর্‌তে পার গা? আমার হাড় জ্বালাতন হয়েছে। যখনি যেখানে যাই, যখনি যে কাজে হাত দিই, তখনই 'কিন্তু' আসিয়া অন্তরায় হয়। আজ থিয়েটার দেখ্‌তে যাব প্রিয়তমাকে বলিলাম। প্রিয়তমা গম্ভীর বদনে বলিলেন, "কিন্তু শীঘ্র ফিরিও।" সেখানে গিয়ে কেবল "কিন্তু'র কথা ভাব্‌ছি—অভিনয়ে মন নাই। প্রহসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই 'কিন্তু' ভাবিয়া গৃহে ফিরিলাম।

স্নেহময়ী জননীকে বলিলাম, "মা, আজ ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাব?" মা বলিলেন, "যাও, কিন্তু দেখো যেন গাড়ীচাপা পড়ো না।" বস্—আমার সব আমোদ ফুরাল। গাছ পালার দিকে আর আমার লক্ষ্য

নাই—কোথায় গাড়ী আস্‌ছে দেখ্‌তেই আমি ব্যস্ত। গাড়ীর টাল্‌ সামলাইতে সামলাইতে কোন রকমে সন্ধ্যা কাটাইয়া গৃহে ফিরিলাম।

আজ শরত দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ—বাবাকে বলিলাম। বাবা বলিলেন,—"যাও—কিন্তু বেশী খাইও না।" সেই খানেই আমার উৎসাহ নিবিয়া গেল। খাইতে গিয়া দেখি, পাতের উপর ছাগমুণ্ড, রোহিত-মুণ্ড। অনিচ্ছা সত্বেও মুণ্ডদ্বয়কে পাতের একধারে সরাইয়া রাখিয়া অর্দ্ধভোজনে গৃহে ফিরিলাম।

বাজারে যাইতেছি, পোড়ারমুখী হিমী দুই আনা পয়সা হাতে দিয়া বলিয়া দিল—"দাদা, আমার জন্য এক-খানা কলের গাড়ী এনো, কিন্তু দুই আনার মধ্যে আন্‌তে হবে।" সমস্ত রাধাবাজার মুর্গিহাটা ঘুরিলাম; কলের গাড়ী অনেক দেখিলাম, কিন্তু কোথাও দুই আনা মূল্যের কলের গাড়ী পাইলাম না। হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া হিমির পয়সা ফিরাইয়া দিলাম। সে বলিল, "দাদা, তুমি এমন!"

দ্বারে ভিখারি ডাকিল, "এক পয়সা মিলায়ে দে যাও রাম", "এক পয়সা মিলায়ে দে যাও, রাম।" পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া ভিখারিকে দিতে যাইতেছি,

বন্ধু হাত চাপিয়া ধরিলেন ; বলিলেন, "পয়সা নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা হয়ে থাকে, কর ; কিন্তু আগে দেখ, লোকটা যথার্থ দয়ার পাত্র কি না।" বন্ধুর কথা শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। দেখি কিনা, ভিখারি বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলবান যুবক। এক 'কিন্তু'র গুঁতোয় পয়সাটা আর ভিখারির হাত পর্য্যন্ত পৌঁছিল না—পকেটেই রহিয়া গেল।

ধড়াচূড়া পরিয়া দশটা বাজিতে না বাজিতে কাছারি রওনা হইলাম। সেখানে গিয়া কাহাকেও মেয়াদ দিলাম, কাহাকেও বা অব্যাহতি দিলাম। সাহেব ইন্‌স্‌পেক্‌সানে আসিয়া আমার কার্য্যাকার্য্য দেখিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "টোমার কামে হাম খুসী আছে ; কিণ্টু ডেখো বাবু, আওর জল্‌দি ফাইল ক্লিয়ার কর্‌নে হোগা।" তারপর মকর্দ্দমা করিয়া ফাইল ক্লিয়ার করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু এই 'কিণ্টু'র ঘায়ে আমার আর বিচার করা হইল না।

নিশীথে গৃহে চোর ঢুকিয়াছে—গৃহিণী ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলেন। দ্বার খুলিয়া লগুড়-হস্তে বীরদর্পে তার অনুসরণে উদ্যত। গৃহিণী আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিয়া দিলেন,—"কিন্তু দেখিও, সে যেন খোঁচা মারে না।" বস্—আমার সাহস উৎসাহ নিবিয়া গেল।

চোর ধরিব কি, আত্মরক্ষায় বিব্রত। অবশেষে লাঠি ছাড়িয়া গৃহিণীর অঞ্চল ধরিলাম।

তাই বলিতেছি, এই 'কিন্তু' আমায় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। এই 'কিন্তু'র ঘায়ে বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার কোন সুখ শান্তি নাই। আমি তাকে ছাড়িতে চাই, কিন্তু সে যে আমায় ছাড়ে না। আমি কি বিপদে পড়িলাম গা! জীবনটাত কোন রকমে কাটিয়া গেল, কিন্তু—কিন্তু তারপর? তোমরা কে কোথায় আছ বলে দাও না গা, এই জীবনের পর—এই দেহ ধ্বংসের পর পরিণাম কি হইবে? তখনত তোমরা কেহ আমার কাছে থাক্‌বে না, তোমরাত কেহ আমার পানে তখন চাহিয়া দেখিবে না; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিঃসহায়, নিঃসম্বল আমার তখন কি হবে গা?

আমার চাক্‌রি।

—০ঃ(*)ঃ০—

আচ্ছা চাক্‌রির দায়ে ঠেকেছি! আজ এখানে—কাল সেখানে। উপায় নাই—আমরা হুকুমের অধীন। হুকুম আসিল—'তোমাকে মেদিনীপুর হইতে ছাপরায় বদলি করা হইল।' বস্!—অমনি ছুটিলাম। তল্পিতল্পা বাঁধিয়া বন্ধু-বান্ধবদের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্যপথে ছুটিলাম। ছাপরায় আসিয়া দেখিলাম, সব নূতন। নূতন মাটী—নূতন দৃশ্য—নূতন লোক—নূতন ভাষা। এই নূতন দেশে আসিয়া বড়ই বিপন্ন হইলাম। কিছুই ভাল লাগে না—চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকি। দুই একজন পবিত্রাত্মা দয়াপরবশ হইয়া আমাকে নূতন দেশের অভি-নব আচরণ শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ হইল। দেশেও মন বসিল। দেখিতে দেখিতে দুই এক বৎসর কাটিয়া গেল। তখন এই নূতন

দেশ আর নূতন নয়—পুরাতন। কাহারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'য়েছে, কাহারও সঙ্গে বা আত্মীয়তা হ'য়েছে। কাহাকে দাদা বলিয়া ডাকি—কাহাকেও বা খুড়া বলিয়া সম্বোধন করি। এইরূপে ঘরদ্বার পাতাইয়া, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব লইয়া সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। এমন সময়ে নির্ব্বাত নিষ্কম্প মধ্যাহ্নে অশনিনির্ঘোষ তুল্য সংবাদ আসিল, আমাকে চট্টগ্রামে বদলি করা হইয়াছে। আমি অবনত মস্তকে উপরওয়ালার আদেশ গ্রহণ করিলাম। তল্পিতল্পা বাঁধিলাম—বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় লইলাম। তাহারা কাঁদিল—আমিও কাঁদিলাম। আত্মীয় বন্ধুরা সভা করিয়া প্রীতিভোজ দিল—আমার মঙ্গল কামনা করিয়া শোকপীড়িত হৃদয়ে ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা করিল। আমি সেই শোক কোলাহলের মধ্যে সাশ্রুনয়নে বিদায় হইলাম।

নূতন স্থানে যাইবার আগে একবার গৃহে ফিরিলাম। ছুটি—পনর দিনের মাত্র (Preparatory leave)। এই পনর দিন সম্বল করিয়া দেশে চলিলাম। দেশ, অনেকটা পথ—নদীয়া জেলায়। সেখানে গিয়া—বহুকাল পরে জনক জননীর চরণে প্রণাম করিলাম। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিলাম না,—চাকুরি আমাকে টানিয়া লইয়া

চলিল। চাকুরির পিপাসা তখনও মিটে নাই; তাই পরের দাসত্ব করিতে চট্টগ্রামে চলিলাম।

চট্টগ্রাম দূর পথ। জলে স্থলে কতদিন ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি—সব নূতন। কেবল আইন কানুন পুরাতন। সেখানকার ভাব-ভাষা, আচার-ব্যবহার, লোকে শিখাইতে লাগিল—তবে শিখিতে পারিলাম। ক্রমে অধিবাসীদিগের সঙ্গে পরিচয় হইল; এবং কাহারও কাহারও সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। কেহ আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, আমি কাহাকেও বা দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আবার ঘরদ্বার বাঁধিয়া প্রফুল্লচিত্তে বেড়াইতে লাগিলাম। পৃথিবী কত সুন্দর, সেখানে আসিয়া তাহা উপলব্ধি করিলাম। সমুদ্রতীরে বসিয়া যখন, 'তরুরাজিনীলা' তরঙ্গভঙ্গভীম জলধিকে দেখিলাম—যখন তাহার ব্যোমপ্রতিঘাতী গর্জ্জন শুনিলাম, তখন আমার মনে হইল, যেন কোন প্রকাণ্ডকায় পরাক্রান্ত দৈত্যকে জলধিতলে কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে;—যেন সে দিবা রজনী হা হুতাশ করিতেছে—সময়ে সময়ে যেন সে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া হুহুঙ্কার শব্দে ক্ষিতি ব্যোমকে রণে আহ্বান করিতেছে—কখন যেন বা বন্ধন ছিঁড়িয়া

আকাশে পলায়ন করিবার উদ্যম করিতেছে।' সমুদ্র ছাড়িয়া অনন্তবিস্তৃত শৈলমালা পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সাগরতরঙ্গনীলা আকাশের গায় কে যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আঁকিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্রের চিত্র গগনপটে প্রতিবিম্বিত, আকাশের চিত্র বারিধিহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত। সমুদ্র আকাশে মিশামিশি। অনন্তনীলা, অনন্তনীল আলিঙ্গনেচ্ছু—আকাশ, বারিধি হৃদয়স্পর্শী। উভয়ই প্রেমাভিভূত; কিন্তু উভয়ের কেহই আপন গৃহ ছাড়ে নাই। আমিই শুধু আমার সুখময় গৃহ ছাড়িয়া পরের দাসত্ব করিতে বিদেশে আসিয়াছি। যার যেমন কর্ম্মফল। প্রবল কর্ম্মফলকে কে কোথায় অতিক্রম করিতে পারিয়াছে?

আমিই যে শুধু আমার কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছি, তা' নয়—অনেকেই আমার মত—স্থানভ্রষ্ট উল্কার ন্যায়—স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কত পুরাতন লোক, চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল দেখিলাম—কত নূতন লোক কত দূর দেশ হইতে চট্টগ্রামে আসিল দেখিলাম। যাহারা গেল, তাহাদের জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম—যাহারা আসিল, তাহাদের সাদরে সম্ভাষণ করিলাম।

এইরূপে কত লোক আসিল—কত লোক গেল, তাহার সংখ্যা নাই। দেখিয়া শুনিয়াও আমার শিক্ষা হইল না,—আমি মোহে পড়িয়া বিস্মৃত হইলাম যে, আমাকেও এক-দিন চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

কেনই বা আমি চট্টগ্রাম ছাড়িব? এখানে আমার কিসের অভাব? চারিদিকে আমার যশঃ ও খ্যাতি। আমি পদে, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—জ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—গৌরবে হাকিম। উকীল মোক্তার আমার খোসামোদ করে—চোর, ডাকাত, জমিদার আমার প্রীত্যর্থে রাশি রাশি ডালি পাঠায়—মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার সুখ্যাতি করিয়া দীর্ঘ রিপোর্ট লিখেন। এততেও যদি মানুষ না ভুলে, তবে কিসে আর ভুলিবে? আমি ভুলিলাম—এককালে বিস্মৃত হইলাম যে, আমাকে এক-দিন চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

যাইতেও হইল। লোক মুখে শুনিলাম, আমার বদ্‌লির হুকুম আসিয়াছে। এবার বড় কষ্ট হইল—উপরওয়ালার উপর একটু অভিমানও হইল। ভাবিলাম, সাহেব সুবো ধরিয়া একটু চেষ্টা দেখি, যদি আরও কিছু-দিন থাকিতে পারি। কিন্তু সাহেব আমায় রাখিতে পারিলেন না। তখন বাধ্য হইয়া তল্পিতল্পা বাঁধিতে

হইল। বাঁধিতে বাঁধিতে আমাকে কত নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইল; শেষবার, একবার শৈলমালাচিত্রিত নীলাকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম—শেষবার, একবার গিরিরাজিনীলা বারিধিপানে চাহিয়া দেখিলাম। তা'র পর আমার প্রাধান্যের কথা—আমার নামযশখ্যাতির কথা একবার ভাবিলাম। ভাবিতে ভাবিতে, বন্ধুবান্ধবদের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইতে মিশাইতে আমার সাধের চট্টগ্রাম ছাড়িয়া যাত্রা করিলাম।

এ যাত্রায় কর্ম্মস্থানে গেলাম না। দীর্ঘকাল অবকাশ লইয়া গৃহে বসিয়া রহিলাম। বিদেশে যাইতে আর প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু না গিয়াই বা করি কি? আদেশ মান্য করিতে হইবে। হুকুম তামিল করিতে আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে ছুটিতে হইল। এক দেশ হইতে আর এক দেশে, সে দেশ হইতে আবার এক নূতন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কোথাও দুমাসের জন্য ডেপুটেশনে (Deputation), কোথাও বা দু' বছরের জন্য স্থায়িভাবে (?) থাকি। এইরূপে কত দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিলাম। অবশেষে ত্যক্ত, বিরক্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইলাম। অতি কাতরভাবে উপরওয়ালার নিকট পেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত করিলাম।

আমার ঠিক সময় হয় নাই বলিয়া রাজ্যেশ্বর আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন।

তুমিও কি বিশ্বনাথ, আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবে? আমি যে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইয়াছি। কতকাল আর নিজগৃহ ছাড়িয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব? আর যে পারি না প্রভু! কতবার পার্থিব দেহ ধরিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম—কতবার জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করিলাম—কতবার মিছা সুখের জন্য লালায়িত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলাম। শুধু কর্ম্মফলের বোঝা মাত্র লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিলাম! কোন জন্মে দুই দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিলাম—কোন জন্মে পুত্রকলত্র লইয়া সংসার পাতিলাম—কোন জন্মে নাম যশ কিনিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। কিন্তু মনে শান্তি পাইলাম কই? শান্তিময় পিতা! কতবার আর পৃথিবীতে অশান্তিভোগ করিতে পাঠাইবে? আর যে পারি না প্রভু! এখনও কি আমার পেন্‌সনের সময় হয় নাই?

আমার ছোক্‌রা চাকর।

আমি বেশ একটী চাকর পাইয়াছি। ছেলেটার বয়স কম—দেখিতে ভাল—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার বেশ মনে ধরিয়াছে। কাজেও খুব তৎপর—চরকির মত দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আলস্য নাই, ওজর নাই—হাস্যমুখে হুকুম তামিল করিতে সকল সময়ে প্রস্তুত। কিন্তু তার একটা বঁড় দোষ আছে, সে কথা পরে বলিতেছি।

শীতকাল—নিশি প্রভাত-প্রায়। লেপমুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। ঘুম আর হয় না—লেপ ছাড়িতেও ইচ্ছা করিতেছে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম,—"হরিদাস!"

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমার ছোক্‌রা চাকরের নাম হরিদাস। হরিদাসকে ডাকিলাম; হরিদাস রান্নাঘর হইতে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে?"

আমি। চা হ'য়েছে?

হরি। আজ্ঞে হ'য়েছে।

আমি। নিয়ে আয়।

হরি। আজ্ঞে যাই।

মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিদাস গরম চা লইয়া আসিল। আমি লেপমুড়ি দিয়া চা পান করিতে বসিলাম। খাইতে গিয়া দেখি, চা অতিরিক্ত লাল হইয়া গিয়াছে। এক চাম্‌চে মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেখিলাম, চা তিক্ত—খাইবার অনুপযুক্ত। কোন মতে দুইচার চামুচ গলাধঃ করিয়া বলিলাম,—"তুই বেটা বড় আহাম্মক—এতক্ষণ ধরে চা টি-পটে রাখে? কড়া হ'য়ে গেছে—যা' আর খা'ব না।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হরিদাস উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, এই রকম করে চা কর্‌তে বামনঠাকুর আমাকে শিখাইয়া দিল।"

আমি। তোমার মাথা শিখাইয়া দিল,—যা' এখন তামাক আন্‌গে যা।

হরিদাস ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া গেল এবং কলিকা-হস্তে চকিতমধ্যে ফিরিয়া আসিল। এত শীঘ্র তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম,—"এর মধ্যে কি করে তামাক সাজ্‌লি হরিদাস ?"

হরিদাস উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, আগে হ'তে আমি তামাক সেজে রেখেছিলাম।"

আমি পরম আপ্যায়িত হইয়া গড়গড়ার নল দশনে চাপিয়া ধরিলাম। টানিয়া দেখি—টান সরিতেছে না। আমি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলাম, "ওরে বাঁদর করেছিস্‌ কি ? যা, ছিঁচ্‌কে নিয়ে আয়।"

হরিহাস ক্ষিপ্রহস্তে কলিকা নামাইয়া জাঠে ছিঁচ্‌কা দিল। কিন্তু হতভাগা এত জোরে ছিঁচুকা চালাইল যে, গড়গড়ার ক্ষণভঙ্গুর তলা মুহূর্ত্তে ছেঁদা হইয়া গেল। আমি মহা কুপিত হইয়া বলিলাম ;—"হতভাগা বাঁদর, আর তোকে ছিঁচ্‌কে কর্‌তে হবে না—দূর হ। গাড়ুতে জল দিগে যা—গরম জল যেন দিস্‌।"

ছোঁড়া লাফাইয়া ছুটিয়া গেল। আমিও তামাকের আশা ছাড়িয়া চুরুট-মুখে শয্যাত্যাগ করিলাম। পায়খানায় গিয়া শৌচকালে দেখি, বেটা গাড়ুর ভিতর Boiling hot জল পুরিয়াছে। এ স্বদেশীর দিনে 'স্বদেশী' কাগজে ইংরাজী কথা! ছি, ছি! তা' আমি কি করিব ? Boiling hotএর বাঙ্গলা যে আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

ফুটন্ত গরম বলিব? সে যাই হউক, জল এত গরম যে, কা'র বাবার সাধ্য গাড়ুতে হাত দেয়—শৌচ করা ত দূরের কথা। তখন আমি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে মুক্তকচ্ছ অবস্থায়, হাতে কাপড় ধরিয়া পায়খানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

স্নান করিতে বসিয়া হরিদাসকে তেল মাখাইতে বলিলাম। হরিদাস, চৌদ্দপুরুষের ভিতর তৈলমর্দ্দন করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।—সে অতি ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আমি সানুনয়ে বলিলাম,—"বাপু, একটু জোরে দেও।"

বেটা তখন এত জোরে তেল মাখাইতে আরম্ভ করিল যে, পায়ের লোম পট্‌পট্‌ শব্দে ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি তখন সকাতরে বলিলাম,—"আর তোমায় তেল মাখাতে হ'বে না, বাবা—এখন দয়া করে জল আন।"

হরিদাস লাফাইয়া গেল; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই কলসী জল আনিয়া হাজির করিল। আমি গাড়ুর ঘটনা স্মরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জল গরম নয়ত রে?"

"আজ্ঞে না—ঠাণ্ডা।"

তখন মাথায় জল ঢালিতে অনুমতি দিলাম। হরিদাস

হড়্ হড়্ করিয়া মাথায় জল ঢালিল। বাপ্ রে—কি ঠাণ্ডা! যেন হিমালয়শিখর-নিঃসৃত দ্রবীভূত হিমানী-ধারা! আমি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ইঙ্গিতে হরিদাসকে জল ঢালিতে নিষেধ করিলাম। বেটা তাহা বুঝিতে পারিল না—সমানে জল ঢালিতে লাগিল। আমি তখন শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লাফাইয়া উঠিলাম। মাথার উপর কলসী ছিল,—আঘাত লাগিয়া কলসী ভাঙ্গিল—আমার মাথাও ফাটিল।

আমার শরীর বড়ই খারাপ—ডাক্তারদের পরামর্শ মত আমি সন্ধ্যার পর একটু Vinum galicii সেবন করিয়া থাকি। তোমরা হয়ত তাহাকে ব্রাণ্ডি বলিবে; কিন্তু ব্রাণ্ডি বলিলে বস্তুতই আমি প্রাণে ব্যথা পাইব। এক বোতল সোডা ওয়াটারে ছয় আউন্স মাত্র গ্যালিসাই মিশাইয়া পান করিয়া থাকি। অতএব আমি ব্রাণ্ডি বা মদ খাই না। সে কথা যাক্। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি আসিল,—আমারও মন বোতল পানে ধাবিত হইল। হরিদাসকে বলিলাম,—"বোতলটা নিয়ে আয় ত।"

হরিদাস ছুটিয়া গিয়া বোতলের ঘাড় ধরিল। আনিতে আনিতে মধ্যপথে—আমার মাথা আর মুণ্ড—বোতল পড়িয়া গিয়া চুর্‌মার্ হইল।

একটু বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করা আমার অভ্যাস। আমি শয্যায় শুইয়া ওয়েন সাহেবের একখানা বই পড়িতেছি—মাথার কাছে টুলের উপর একটা সেজ জ্বলিতেছে। রাত্রি যখন আড়াই প্রহর তখন আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমি চক্ষু বুজিয়া নিদ্রাঘোরে হরিদাসকে ডাকিলাম। তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, - "আজ্ঞে।"

"আলোটা নিবাইয়া রাখ্।"

হরিদাস ক্ষিপ্রহস্তে আলোটা উঠাইতে গিয়া সমস্ত তেলটুকু আমার মাথা ও বালিশের উপর ফেলিয়া দিল। আমার ঘুম ছুটিয়া গেল। আমি তখন লাফাইয়া উঠিয়া সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই হরিদাসের গণ্ডদেশে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চপেটাঘাত করিলাম। লাভে হ'তে সেজটীও ভাঙ্গিল।

ভাবিলাম, হরিদাসকে আর রাখিব না। হতভাগা যে কাজটা করিতে যায়, সেই কাজেই একটা না একটা গোল বাধাইয়া বসে। কিন্তু তা'রই বা অপরাধ কি? সেত নিয়ত আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। তবে সে অজ্ঞ—ঠিক উপায় জানে না। যে যেমন শিখাইয়া দিয়াছে, তাহার বুদ্ধি ও সামর্থ্যে যাহা কুলাইতেছে, সে

তেমনই করিতেছে। আমার সন্তোষ-বিনোদন তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কখন সফলকাম হয় না।

আমিও যে সফলকাম হই নাই, প্রভু! আমিও হরিদাসের ন্যায় তোমার সন্তোষ-বিনোদনার্থ অহরহঃ চেষ্টা করিতেছি, বিশ্বপিতা! কিন্তু অজ্ঞ, জ্ঞানহীন আমি যে কোন উপায় জানি না। আমাকে পথ দেখাইয়া দেও, বিভো! আমাকে যে যা' পথ দেখাইয়া দিয়াছে—যে যা' শিক্ষা দিয়াছে, আমি সেই সেই পথ ধরিয়া—সেই সেই শিক্ষা মাথায় করিয়া তোমার প্রসন্নতা-লাভের আশায় ছুটিয়া চলিয়াছি ; কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ পদে পদে তোমার বিরাগভাজন হইয়াছি।

কোথায় অকূলের কাণ্ডারী, দয়াময় বিশ্বনাথ, আমার এ অজ্ঞানতা—এ মোহাচ্ছন্ন তামসান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া দেও। আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না,—আমি শুধু তোমাকে চাই—তোমার প্রসন্নতা চাই। কি করিলে আমি তোমাকে পাইব, আমাকে তাই বলিয়া দেও, বিভো!

ফেউ।

—৵—

আচ্ছা ফেউ পিছু লেগেছে,—মুহূর্ত্তের জন্যও আমার নিস্তার নাই। যেখানেই কেন যাই না, ফেউ আমার পাছু ছাড়ে না। ফেউয়ের দৌরাত্ম্যে আমার আর শান্তি নাই—আমি হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হ'য়ে উঠেছি।

বাজারে গেলুম, ইচ্ছা দু'টা মুরগির আণ্ডা লইব। ওমা, চেয়ে দেখি, ফেউ বেটা আমার সঙ্গে। যেমনি আণ্ডায় হাত দিয়েছি, অমনি বেটা মহা চীৎকার ক'রে ব'লতে লাগ্ল, "মুরগির ডিম কিন্‌ছে গো,—জাত-ধর্ম্ম আর রাখ্‌লে না গো।" বস্—ডিম পড়ে রইল—আমি সরে দাঁড়ালুম।

কন্‌কনে শীত, রাস্তা হাঁট্‌তে আর পারি না; ভাবিলাম এক গ্লাস হুইস্কি টানি। শরীর রক্ষার্থে এই সাধু সঙ্কল্প মনে মনে এঁটে শুঁড়ির দোকানে ঢুকেছি মাত্র, আর ফিরে দেখি কিনা, ফেউ বেটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছে। তা'কে দেখে আমার হাড় জ্বলে গেল;

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না—হুইস্কি না টেনেই চম্পট দিলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, পথের ধারে সারি দিয়া বারাঙ্গনাদল। তা'দের মধ্যে একটা মেয়ের বেশ নধর শরীর—প্রফুল্ল মুখ—টানা চোখ। ভাবিলাম, একটু আমোদ করা যা'ক। আমোদ কি আর আমার কপালে আছে!—পিছন ফিরে দেখি, সেই ফেউ বেটা! বেটা আবার ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে ইঙ্গিতে আমাকে সতর্ক করছে। ভাবিলাম, বেটাকে আচ্ছা করে পয়জার পেটা করি; কিন্তু সাহস হ'ল না।

গৃহিণীর আদেশে বাজারে বেরিয়েছি। চুড়ি, এসেন্স, সাবান—নানাবিধ ফরমাজ। দেখিলাম, বিলাতী জিনিষগুলা দেখিতে ভাল, দরেও সস্তা। স্বদেশীর আমি একজন মস্ত পাণ্ডা হইলেও গোপনে বিলাতী জিনিষগুলা কিনিতে ইচ্ছা করিলাম। চারিদিক চাহিয়া ভয়ে ভয়ে, খাঁটি বিলাত-জাত দ্রব্যসম্ভার পকেট-জাত করিতেছি, এমন সময়—ও বাবা গো, আবার সেই বেটা! আমি জিনিস ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চাঁদনি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

এই স্বদেশীর দিনে নাম কিনিবার আশায় (পয়সার লোভটাই বেশী) একটা স্বদেশী হাট বসাইলাম। জেলার

সাহেব চো'খ রাঙ্গাইয়া 'টাইটেল' কাড়িয়া লইতে চাহিল। আমি ছাঁকা বিদেশী ভূষায় সজ্জিত হইয়া—সাহেবের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া সাহেবকে শান্ত করিতে জুড়ি হাঁকাইয়া চলিলাম। গাড়ীতে উঠে দেখি, ফেউ বেটা আমার আগে গাড়ীতে উঠে বসে আছে। আমাকে দেখিয়াই সে চোখ রাঙ্গাইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "আমি সকলকে বলিয়া দিব, তুমি গোপনে দেশের স্বার্থ বেচিতেছ।" সে যাত্রা আমার আর যাওয়া হ'ল না,—আমি বাড়ী ফিরিয়া অগত্যা স্বদেশী সাজিলাম।

স্ত্রী চিররুগ্ন দেখিয়া ভাবিলাম, একটা বিবাহ করি। স্ত্রী কাঁদিয়া কাটিয়া বলিল, "ওগো, দু'দিন অপেক্ষা কর—আগে আমি মরিয়া যাই।" আমি শুনিলাম না,—একটা ষোল বছরের দুগ্ধালক্তকনিন্দীবরণা পিনোন্নত পয়োধরা আমার লক্ষ্য। আমি কি তখন পরিবারের কান্না দেখে ভুলি। আমি মহা উৎসবে বর সাজিলাম। টোপর মাথায় দিয়া ছান্‌লাতলায় উপস্থিত। কাপড় ঢাকা দিয়া যখন ক'নের মুখ দেখিলাম, তখন ক'নের পাসে আর একজনকে দেখিলাম। সে কে বুঝেছ ? সে আমার চিরভীতি ফেউ বেটা। বেটা গম্ভীর বদনে অঙ্গুলি হেলাইয়া আমাকে বলিল, "ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির বাসনায় এক স্ত্রী

ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও?" আমি দাঁড়াইলাম না,—কাপড় ফেলিয়া দিয়া একছুটে গৃহে আসিলাম। আমার কপালে দুষ্কালক্তকনিন্দীবরণা আর জুটিল না।

আপিষের ক্যাশ আমার জিম্মা। ভাবিলাম, কিছু টাকা ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যতের সুরাহা করি—সাহেবের বাবাও কিছু জানিতে পারিবে না। একদিন নিরিবিলিতে লোহার সিন্দুকের ডালা খুলিলাম। নোটের তাড়ায় হাত দিতেছি, এমন সময়—বাবা গো—দেখি কিনা সেই বেটা সিন্দুকের মধ্যে বসিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। আমি ভবিষ্যতের সুব্যবস্থার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া রিক্তহস্তে চম্পট দিলাম।

তাই বলিতেছি, এই ফেউ বেটার জ্বালায় আমার কোন সুখ নাই। অহরহ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আমার বাড়া ভাতে ছাই ঢালিতেছে। যখনই পাঁচ ইয়ার সঙ্গে লইয়া কোন বিলাস-মন্দিরে একটু আমোদ করিতে যাইব মনে করিতেছি, অথবা কাহাকেও ফাঁকি দিয়া দু' পয়সা উপায় করিবার চেষ্টা করিতেছি, তখনই এই ফেউ বেটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার বাসনার অন্তরায় হয়। হাঁ গা, ফেউ বেটাকে তাড়াইবার কোন ঔষধ তোমরা জান

পা? আমি যে অস্থির হ'য়ে পড়েছি—শয়নে-ভোজনে, স্বদেশী-আন্দোলনে কোথাও শান্তি পাই না। বেটা আজীবন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্ছে—জীবন ভোর আমাকে জ্বালাইয়া মার্ছে। হাঁ গা, জীবন অবসান না হ'লে কি এর হাত হ'তে আমার পরিত্রাণ নাই? ভগবান্, শৈশব হইতে এ কা'কে আমার সঙ্গে জুটাইয়া দিয়াছ? আমি ছাড়িতে চাহিলে, এ যে আমায় ছাড়ে না! যখন বিপথে পা বাড়াই তখন আমাকে সতর্ক করিয়া সুপথে আনে। এ কে প্রভু? এ কে প্রভু, উপদেষ্টা হ'য়ে সকল সময়ে আমাকে উপদেশ দেয়? দয়াময় বিশ্বনাথ, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যেন শয়নে বিচরণে, সম্পদে-বিপদে সকল সময় এই উপদেষ্টা আমার সঙ্গে ফিরে—আমি ছাড়িতে চাহিলেও যেন আমাকে না ছাড়ে।

ডাকঘর।*

—+—

তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, ডাকঘর। আমি দুম্‌কার জঙ্গলে বসিয়া সম্পাদক মহাশয়কে একখানা পত্র লিখিলাম, তুমি ঝমর ঝমর করিয়া বাহিয়া চলিলে। পাহাড়-জঙ্গল কিছুই মানিলে না—ঝড়-বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করিলে না,—নিয়মিত সময়ে পত্রখণ্ড কাঁকালে করিয়া তাঁহার সমীপে হাজির হইলে। তিনি হয়ত সে সময় কাগজের প্রুফ দেখিতেছিলেন; এমন সময় তুমি বায়স-নিন্দী কণ্ঠে হাঁকিলে,

---

* শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দিয়া জাহ্নবীতে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রকাশক।

"বাবু, চিঠি আছে।" বাবু লেফাফা খুলিয়া দেখিলেন,—প্রণয়-পত্র নয়—একটা প্রবন্ধ। তিনি তৎক্ষণাৎ মহা বিরক্তি সহকারে "rubbish, nonsense" বলিয়া লেফাফা দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মলয়ানিল-সেবিত, বিহঙ্গমকূজিত সরিৎপ্রফুল্ল পুষ্পোত্থান মধ্যে বসিয়া ভাবিলাম, স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখি: তিনি তখন অনেক দূরে—তাঁহার পিতার সঙ্গে বৈদ্যনাথে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন। আমি বিরহাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। মাথার উপর অনন্ত বিস্তৃত কোমল নীল আকাশ—পদনিম্নে দর্পণ তুল্য স্বচ্ছ জলরাশি, আমার আশে পাশে গগনমধ্যস্থিত নক্ষত্রবৎ গোলাপ, মল্লিকা, বিগ্নোনিয়া। অঙ্গের উপর—প্রণয়িনী হস্তাধিক কোমল স্পর্শে মলয় মারুত বহিয়া যাইতেছে; চারিদিকে ভ্রমর গুঞ্জন। আমি কণ্টকিত দেহে এই বসন্ত অধিষ্ঠিত পূর্ণবিকশিত রাজ্য মধ্যে বসিয়া পূর্ণযৌবনা প্রণয়িনীকে পত্র লিখিতে বসিলাম।

ডাকঘর, তুমি আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া দুইটী পয়সা মাত্র রাস্তা খরচ সম্বল করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলে। নন্দন পাহাড়ের উপর যেখানে বসিয়া আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়রাণী সুন্দর আকাশ

প্রান্তে চাহিয়া বিরহের তপ্ত নিশ্বাস ছাড়িতেছিলেন, তুমি সেইখানে পত্রের সহিত আমার বিরহ নিশ্বাস বহিয়া লইয়া হাজির করিলে। কমলদল-বিনিন্দিত কোমল হস্তে গৃহিণী (ছিঃ, গৃহিণী নয়—প্রণয়িনী) পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন; আবার চম্পককলি-নিন্দা ক্ষুদ্র অঙ্গুলীনিচয়ে লেখনী ধরিয়া আমাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। তুমি তাহাও আবার আমার কাছে বহিয়া আনিলে।

এ অসার খলু সংসারে চাকুরির মত কিছুই নাই। ভাবিলাম, একটা চাকুরি করি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতে থাকিলাম। যেখানে কর্ম্মখালি দেখি, সেইখানেই আমার মন, কুসুমমধু-লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। দেখিয়া শুনিয়া একটা দরখাস্ত লিখিলাম। লেফাফায় আঁটিয়া তোমার হাতে দিলাম, তুমি বিনা ওজরে তাহা গ্রহণ করিয়া কিছু জলপানির আশায় আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলে। আমি দুইটী পয়সা দিলাম; তুমি কাতর মুখে বলিলে, "বাবু, লেফাফাটা বড় ভারি, আর দুইটা পয়সা পাইলে ভাল হয়।" আমি তাহাই দিলাম। তুমি তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল বদনে আমার পত্র লইয়া ছুটিলে।

তাই বলিতেছিলাম ডাকঘর, তোমার গুণ অনেক; তোমার তুলনা সংসারে বিরল। আমার প্রেয়সীর যতগুণ,

বুঝি তোমারও তত। অতএব সরিয়া এস, তোমার স্তুতিগান করি। অয়ি রেল-ষ্টিমার-গামিনী, প্রেমপত্র-প্রবন্ধ-আবেদনবাহিনী, তোমাকে নমস্কার। তোমার ঊর্দ্ধে নমস্কার, তোমার অধোদেশে নমস্কার, তোমার সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাদ্‌ভাগে নমস্কার, তোমার চারিদিকে নমস্কার। তুমি স্থল-জল-ব্যোম ব্যাপিয়া আছ। কখন স্তম্ভরূপে নিশ্চল অবস্থায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাক, কখন বা গৃহ-প্রাচীরে দেহ সংগোপন পূর্ব্বক উষ্ট্রবৎ ওষ্ঠদ্বয় ব্যাদান করিয়া স্ফীতোদরে বসিয়া থাক। তুমি কখন যন্ত্রমুখে বসিয়া তাড়িত ছুটাও, কখন বা জাহাজে উঠিয়া পৃথিবী বেড়াও। তুমি কখন ঝমর ঝমর শব্দে মল বাজাইয়া পথ হাঁটিয়া চল, কখন বা রেলপথ অবলম্বন করিয়া মেঘ গর্জ্জনবৎ হুঙ্কারশব্দে জলস্থল প্রকম্পিত করিতে করিতে উল্কাগতিতে ছুটিয়া চল। তোমার মহিমা অপার, এ সংসারে তুমি সকলই পার।

সকলই পার কি ডাকঘর? আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস, অন্তিমের আবেদন বহিয়া লইয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণে পৌঁছিয়া দিতে পার কি, ডাকঘর? আমার সম্পদ, ঐশ্বর্য্য যা কিছু আছে সকলই তোমাকে দিব, তুমি আমার নিরুদ্ধ হৃদয়-ব্যথা একবার সেই সর্ব্বদুঃখ-

বিনাশনের চরণে পৌঁছাইয়া দিয়া এস। বহুকাল হইল সেই অনন্তধাম ছাড়িয়া আসিয়াছি, যুগযুগান্তর বহিয়া গেল, তবু সে পিতৃগৃহের কোন সংবাদ পাইলাম না; তুমি একবার বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া গিয়া সেখানকার সংবাদ আনিয়া দেও, আমার প্রাণের ব্যথা পরম পিতার চরণে নিবেদন করিয়া এস; পার যদি, একবার শুধাইয়া এস, কতদিনে আবার পিতৃগৃহে ফিরিতে পাইব। কোড়ে, পাইড়ে দেখিয়াছি, তুমি সর্ব্বস্থানে যাইতে পার; সমুদ্রের ভিতর, অন্তঃরীক্ষে, সর্ব্বস্থানে তোমার যাতায়াত। তবে হে ডাকঘর, তোমার পায়ে ধরি, আমার একখানি প্রেম-পত্র, একখানি সকরুণ আবেদন বহিয়া লইয়া আমার পিতার চরণে পৌঁছাইয়া দিয়া এস। পার না কি ডাকঘর?

সমাপ্ত।

শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত উপন্যাস নিচয়।

——*——

বীরপূজা।

(উপন্যাস)

দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্দ্ধিত—৪২০ পৃষ্ঠা—ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য দেড় টাকা।

বাঙ্গালীর বল।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ—৪৬০ পৃষ্ঠা—ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য দেড় টাকা।

বঙ্গসংসার।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

৪০০ পৃষ্ঠা—ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট—মূল্য দেড় টাকা।

রাজা-গণেশ।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

বাঙ্গালী-রাজার অভ্যুত্থান—৪৭০ পৃষ্ঠা—উত্তম ছাপা ও বাঁধাই—মূল্য দেড় টাকা।

নীরদা।

(ক্ষুদ্র উপন্যাস)

১১৪ পৃষ্ঠা—মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মেডিকেল লাইব্রেরীতে ও "বসুমতী" পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

যশস্বী সুলেখক

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিদ্যাভূষণ প্রণীত।